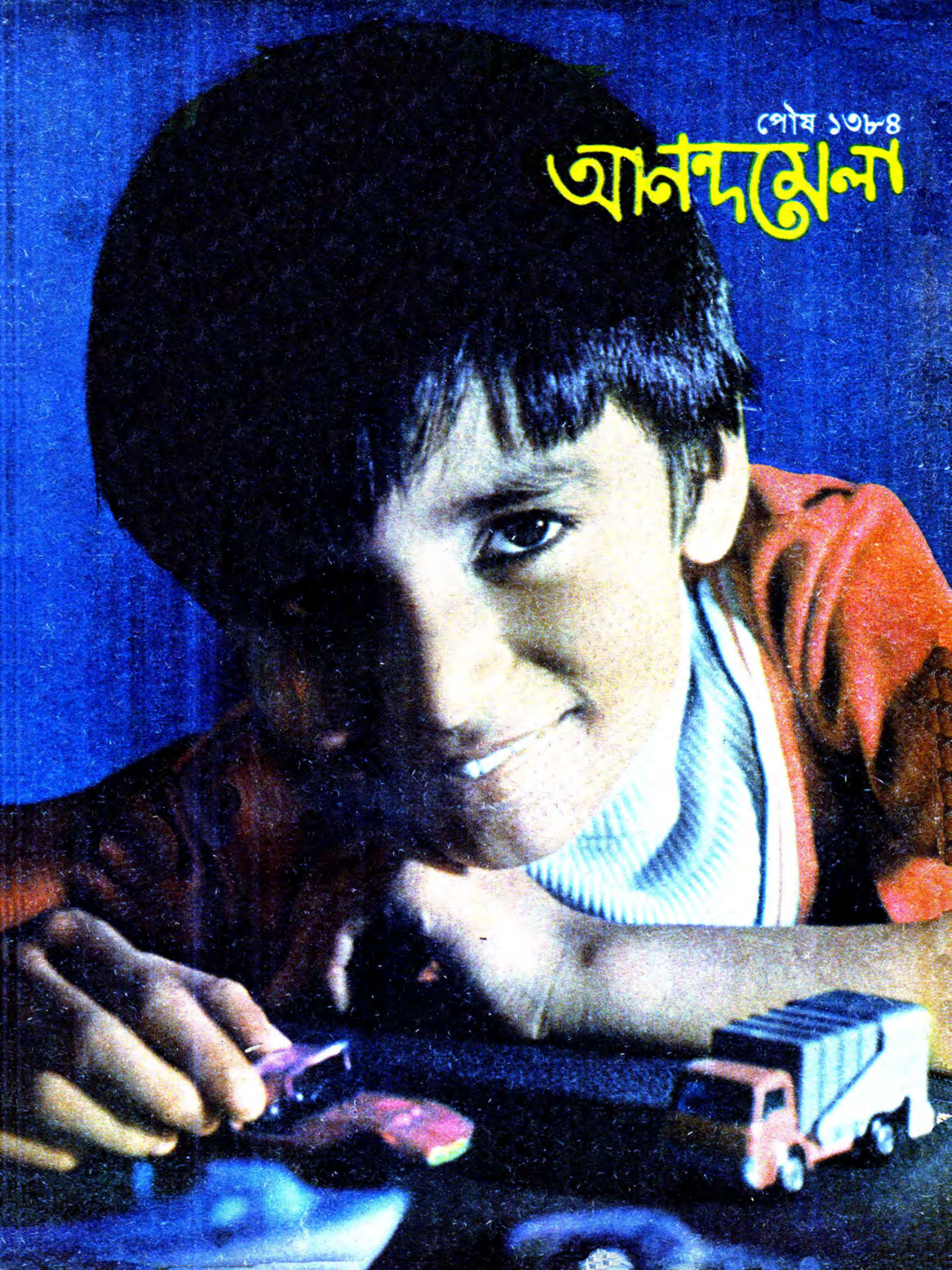

পৌষ ১৩৮৪

আনন্দমেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড : ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছোটদের গান শেখার প্রতিযোগিতা

মোট পঁচিশটি পুরস্কার
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার-
রেকর্ড প্লেয়ার ও রেকর্ড।
আরো বাইশটি পুরস্কার

গান বাজনায় পারদর্শী না হলেও
উৎসাহী হলেই যথেষ্ট হবে।

খুব সোজা। সহজেই জিতে নিতে পারো। আমাদের **অন্তরা চৌধুরীর**

ইনরেকো

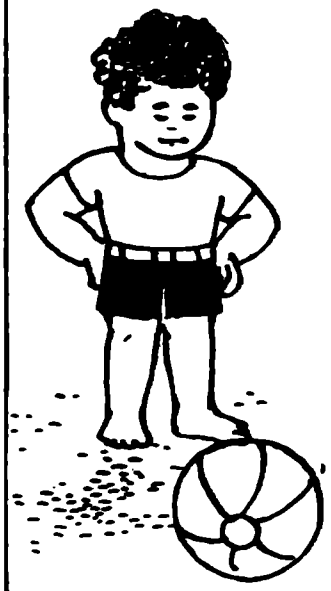

রেকর্ডর (২৫২৬-৪০০৯) যে গানটি তোমার ভাল লাগে, গাইতে শেখ অথবা যে কোন যন্ত্রে বাজাতে শেখ। কোন প্রবেশ মূল্য নেই। কেবল তোমার বয়স বারো বছরের মধ্যে হওয়া চাই। রেকর্ডের সঙ্গের কুপনটি ভর্তি করে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও। গান গাইবার জন্য এবং বাজাবার জন্য তোমাদের ডাকা হবে ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে, তোমাদের পরীক্ষার পরে।

এখনই তোমার রেকর্ডের ডীলারের কাছে অন্তরা চৌধুরীর রেকর্ড ও কুপন সংগ্রহ করো।
কি ? সোজা নয় ? তাড়াতাড়ি করো।

দি ইণ্ডিয়ান রেকর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
৪৫, মতি শীল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

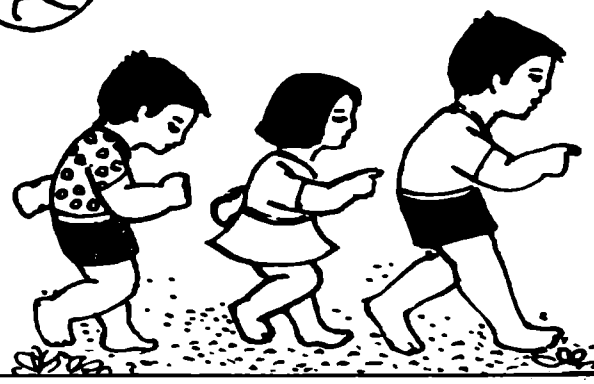

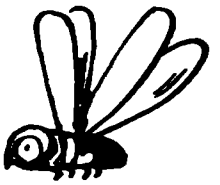

সুখবর

বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধে প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ দিন ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭
পৌষ ১৩৮৪ ডিসেমবর ১৯৭৭ তৃতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প
দুই মা । লীলা মজুমদার ৭
সন্তু কোথায় । প্রদীপচন্দ্র বসু ৪১
হালুম হুলুম । সুনীল জানা ৫১

বিশেষ রচনা
মোটর রেস । রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫

উপন্যাস
বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ১৮
অলৌকিক । বিমল কর ৩৭

আত্মকথা
খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ৯

কবিতা ও ছড়া
এই নদী কি সেই নদীটি । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬
ক্ষীর । মনোজিৎ বসু ৫০
বিদেশী ছড়া । মণিকা দত্ত ৫৫

কমিক্স
ভূতুড়ে গাড়ি ১৩, টারজান ২২, গাবলু ২৫
টিনটিন ৩০, নোলেদা ৫৩

খেলাধুলো
অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী । চিরঞ্জীব ৪৪
চোখ-ধাঁধানো ব্যাডমিন্টন । মনোজ গুহ ৪৫
উঠতি দুই টেনিস-তারকা । সুব্রত সরকার ৪৭
স্রোতের বিরুদ্ধে সহদেব । বঙ্গসেন ৪৯

লেখাপড়া
হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৩৩

ধাঁধা-মজা-রহস্য
আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯
কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা
মণিমেলার খবর ১২, মজার পড়া । কুম্ভক ১৫
তোমাদের পাতা ২৪, বিশ্ববিচিত্রা । দিদিমণি ৪০
ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ৪৮
আঁকো । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ ,শেখো । কারিগর ৫৪

প্রচ্ছদ
জে বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত ।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

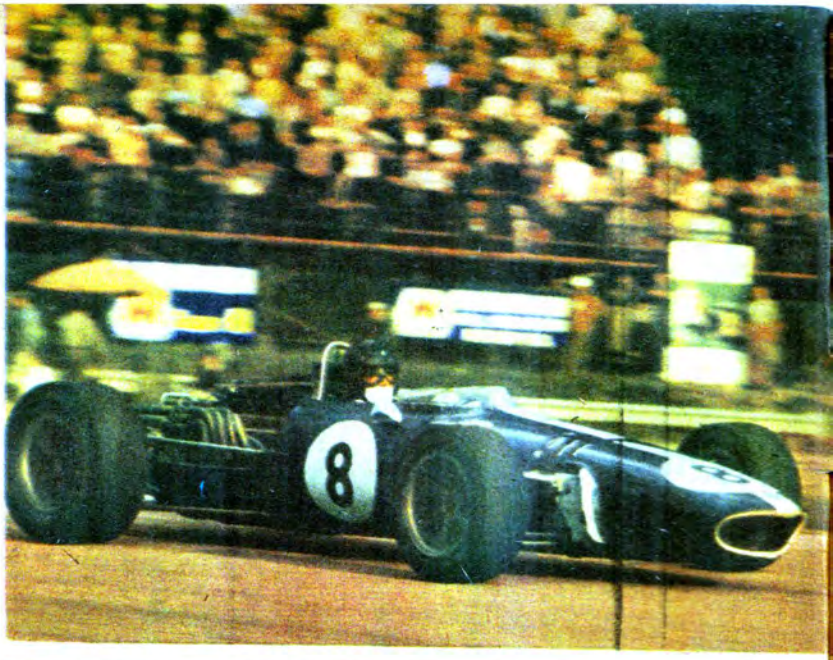
8

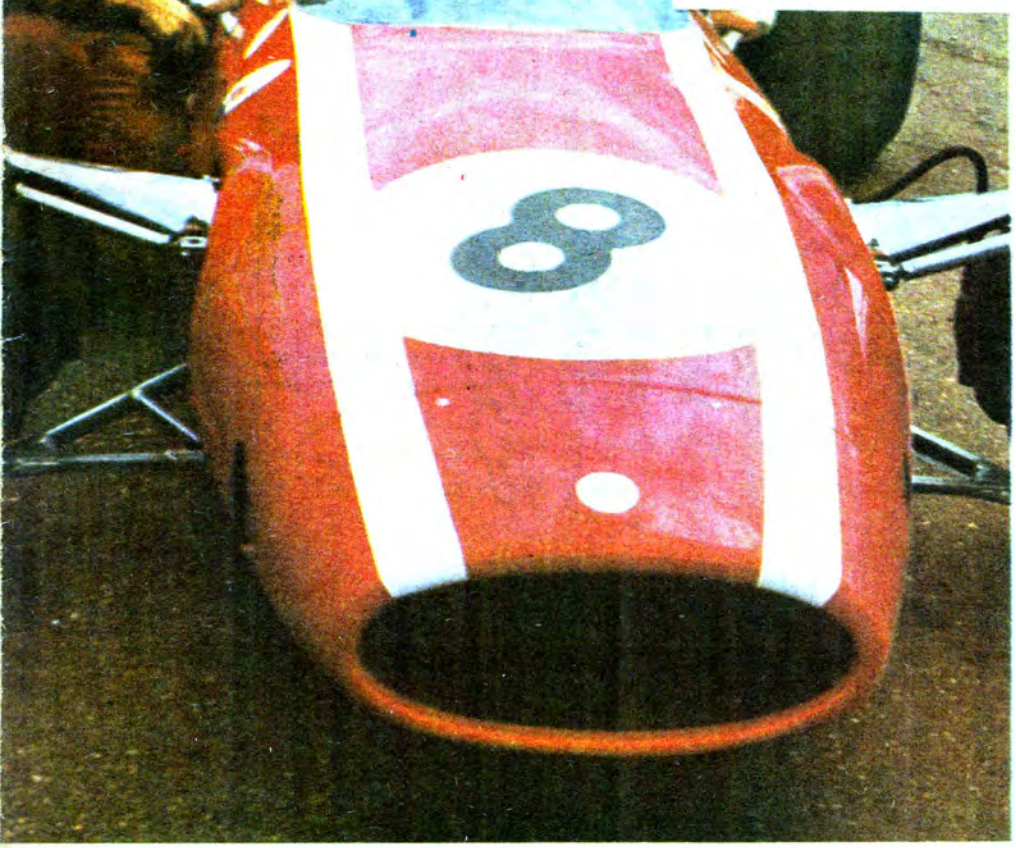
8

64

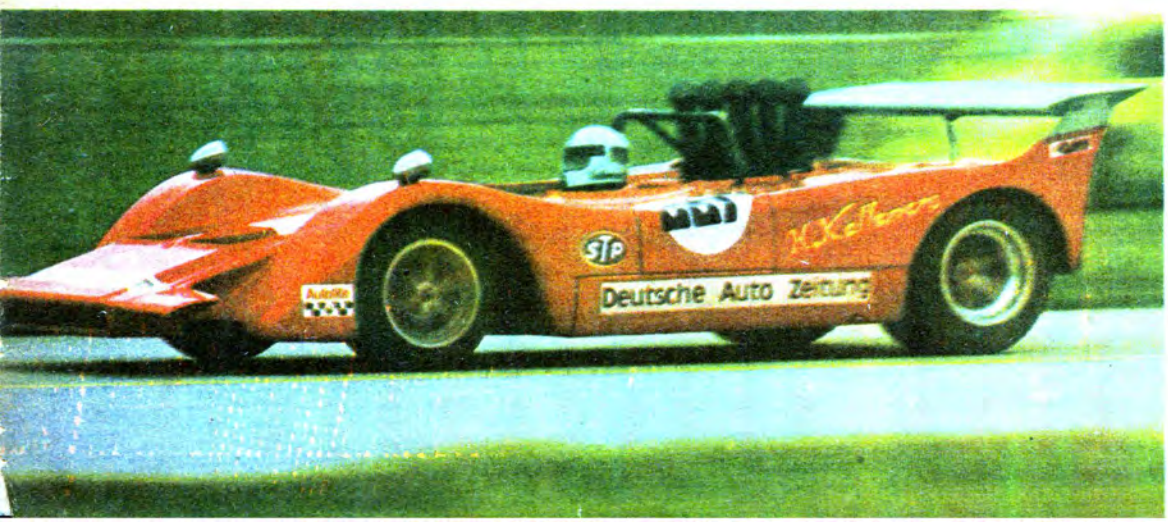
STP
Deutsche Auto Zeitung

6

মোটর-রেস !

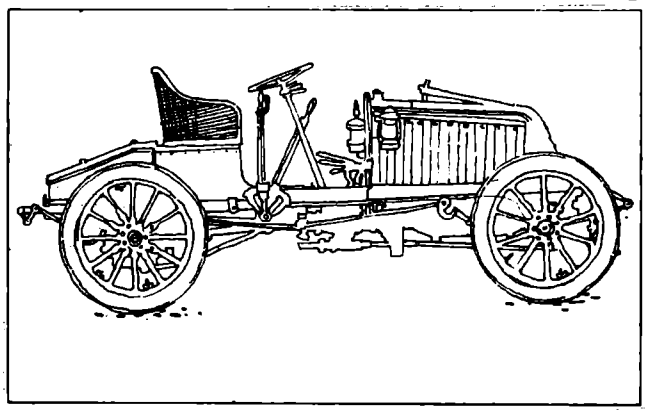

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চলেছি গিরিডি থেকে ধানবাদ। মনে আছে চওড়া, মসৃণ, উঁচুনিচু ঢেউ-খেলানো, জনবিরল পথ। আমাদের গাড়িটা চলেছে দারুণ জোরে। আমি তখন তোমাদের মত ছোট। মায়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে দেখছি পথের দু-পাশের গাছপালা, টেলিগ্রাফের খুঁটি সব শোঁ শোঁ করে উলটো দিকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু আড়চোখে বারবার স্পীডোমিটারের কাঁটাটাকে দেখে নিচ্ছি। এত জোরে যাচ্ছি, কিন্তু কাঁটাটা ঘণ্টায় ষাট কিংবা পঁয়ষট্টি মাইলের বেশি একবারও উঠছে না। আর গাড়িটা যখন মোড় বেঁকছে, কিংবা পথে অন্য কোনো গাড়ি এসে পড়ছে, কাঁটাটা ঝপ করে নেমে আসছে একেবারে তিরিশের ঘরে। আমার খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন। আর কাঁটাটা যখন একটু একটু করে ওপরে উঠতে-উঠতে ষাটে এসে পৌঁছচ্ছে, তখন ভাবছি সেটা ৭০, ৮০, ৯০ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ১০০-তে যেতে পারছে না কেন? গাড়িটা নিশ্চয় খারাপ কিংবা পুরনো।

সেই ছোটবেলার মত আজও আমার এ কথা ভাবলে মন খারাপ হয় যে আমি এ পর্যন্ত এমন কোনো গাড়িতেই চড়িনি যার গতি ঘণ্টায় ৭০ পেরিয়ে ৮০, ৯০ কিংবা ১০০ মাইলে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে। অথচ প্রায় সব গাড়িরই স্পীডোমিটারের গায়ে ৮০ কিংবা ১০০ পর্যন্ত লেখা আছে। কেন যে ওরকম লেখা থাকে সে-কথা আমার মাথায় ঢোকে না। আমার খুব ইচ্ছে করে কোনো গাড়ি একশো মাইল জোরে গেলে সে-গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকতে ঠিক কেমন লাগে, সেটা দেখতে। আমি জানি এটা কিন্তু খুব অন্যায় ইচ্ছে, কেননা কলকাতার রাস্তায় ১০০ কেন, ঘণ্টায় ৪০ মাইল জোরেও গাড়ি চালানো উচিত নয়।

কিন্তু ধরো, উত্তর মেরুতে, যেখানে মাইলের পর মাইল ধরে বিছিয়ে রয়েছে বরফের উপত্যকা—সেখানে ঠিক কত জোরে গাড়ি চালানো যায় ভেবে দেখেছ? শুধু বরফের ওপর চালানোর জন্যে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ গড়নের মোটর গাড়ি। সরু, লম্বা, ছুঁচলো, অনেকটা হাউই বাজির মত দেখতে এই গাড়িটা বরফের ওপরে ঘণ্টায় ৬০০ মাইল জোরে চলতে পারে। গাড়িটার নাম রু-ফ্লেম। ১৯৭০ সালে গ্যারি গ্যাবেলিক এটি ঘণ্টায় ৬৩০ মাইল জোরে চালিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু এ গাড়ি এমনি রাস্তায় চলতে পারে না বলে একালের কোনো মোটর রেসেই এর স্থান হয়নি। যদি উত্তর মেরুর বরফের সীমাহীন উপত্যকায় কোনোদিন কোনো মোটর-রেস হয়, তাহলে সেখানে গাড়ির গতি হবে ঘণ্টায় ৬০০ মাইল কিংবা তার চেয়েও বেশি!

ইদানীং কালের মোটর রেসে গাড়ির গতি ঘণ্টায় ১৭০ কিংবা ২০০ মাইল পর্যন্ত ওঠাটাও খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। যেমন ধরো টিরেল-ফোর্ড নামের গাড়িটা ঘণ্টায় ১৯০ মাইল পর্যন্ত ছুটতে পারে। এরকম দুর্ধর্ষ গাড়ি না হলে কি আর জ্যাকি স্টুয়ার্ট ১৯৭১-এর চ্যাম্পিয়ন হতে পারত?

এ-সব গাড়ির ছবি দেখলেই বুঝবে তোমাদের পরিচিত সব সাধারণ গাড়ির থেকে এদের চেহারার কত তফাত। খুব জোরে মোড় নেওয়ার সময় যাতে উলটে না যায় সে জন্যে এদের চাকা-গুলো বিশেষভাবে তৈরি। বাতাসের বিরুদ্ধে ছুটতে গিয়ে যাতে না একটুও বাধা পেতে হয় সে জন্যে এদের চেহারাটা সরু, লম্বা। প্রতিযোগিতায় গাড়িগুলো মারাত্মকভাবে জখম হতে পারে বলে এদের কোনো অংশই কাচের তৈরি নয়।

ইওরোপ-আমেরিকার বিখ্যাত মোটর-কোমপানিগুলিতে তৈরি হয় নানান জাতের রেসিং-কার। গাড়ির দৌড়-প্রতিযোগিতার চেয়ে রেসিং-কার তৈরির প্রতিযোগিতাটাও কিছু কম নয়। যেমন ধরো, ১৯৬৮ সালে আমেরিকায় তৈরি হল লোটাস, মার্ক ফিফ্‌টিসিকস। ঘণ্টায় ১৬৯ মাইল ছুটে গাড়িটা সব্বাইকে হারিয়ে দিল। কিন্তু খুব জোরে ছোটবার সময় লোটাস-এর চাকা মাটি থেকে লাফিয়ে উঠত বলে ঘণ্টায় ১৬৩ মাইল যেতে গিয়ে মাইক স্পেনসের মত ড্রাইভারকে নিয়ে গাড়িটা একদিন পথ থেকে ছিটকে গেল। স্পেনসের আঘাত এতই গুরুতর ছিল যে তাঁকে বাঁচান গেল না। ১৯৭২ সালে তৈরি হল আরও আধুনিক গঠনের রেসিং-কার, ঈগল। বিব আনসার এই দুরন্ত গাড়িটাকে ঘণ্টায় ১৯৬ মাইল জোরে চালিয়ে লোটাসের রেকর্ড ম্লান করে দিলেন। শুধু তাই নয়, লোটাসের যে-সব দোষ ত্রুটি ছিল সেগুলো ঈগলের ছিল না।

আজকাল নানারকমের রেসিং-কার দেখতে পাওয়া যায়। আর যত রকমের গাড়ি, তত রকমের নাম : ম্যাকলারেন-সেভরোলে, মার্চ-ফোর্ড, অ্যালপাইন-রেনলট, ঈগল-ওফেনহুজার, মার্চ-ক্যানঅ্যাম, মারলবোরো টিরেল-ফোর্ড, ফেরারি আর লোলা-সেভরোলে। প্রত্যেকটি গাড়ির আবার আলাদা-আলাদা কোড-নাম্বার আছে। এ সব গাড়ির ফরমুলা নিয়ে নিরলস গবেষণা করছেন টনি সাউথগেট, ডেরেক গার্ডনার, রন টরানাক, রবিন হার্ড প্রভৃতি ইওরোপ-আমেরিকার বিখ্যাত মোটরগাড়ি বিশারদরা। ফলে প্রতি বছরই নতুন নতুন রেসিং-কার তৈরি হচ্ছে আর গাড়িগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এসব গাড়ি যখন পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় দৌড়য় তখনি এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি খুব ভালভাবে বোঝা যায়। কোনোটা মাটি কামড়ে খুব জোরে মোড় বেঁকতে পারে। কোনোটা আবার বৃষ্টি-ভেজা পিছল পথেও ঘণ্টায় ১৫০ মাইল জোরে ছুটতে ওস্তাদ। আর, কোনোটির গতি এক লাফে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১০০ মাইলে উঠতে পারে।

মোটর রেসের শুরু হয় আজ থেকে বিরাশি বছর আগে ১৮৯৫ সালে। তখন কিন্তু রেসিং-কার বলে কিছু ছিল না। গাড়ির এই দৌড় প্রতিযোগিতাটি হয়েছিল প্যারিসে। এই প্রতি-যোগিতায় ঘণ্টায় ১৫ মাইল গতিতে এক নাগাড়ে ৪৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট গাড়ি চালিয়ে যিনি জিতেছিলেন তাঁর নাম এমিল লেভাসর। গাড়িটি তৈরি করেছিলেন জগৎ-বিখ্যাত ডেমলার। গাড়িটির নাম ছিল প্যানহার্ড।

১৮৯৯ সালে তৈরি হল ক্যানস্টাট-ডেমলার নামে প্রথম রেসিং-কার। ১৯০২ সালে প্যারিস থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতায় কিন্তু ডেমলার-এর প্যানহার্ড গাড়িই আবার জিতল ঘণ্টায় ৩৮ মাইল জোরে ছুটে। ঘণ্টায় ৩৮ মাইল সে যুগে ছিল একটা মারাত্মক ব্যাপার। আর ১৯০৩ সালে প্যারিস থেকে মাদ্রিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতায় একটা মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটল। কয়েকটা গাড়ি একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে পেরিয়ে যেতে গিয়ে একেবারে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এই দুর্ঘটনায় প্রচুর লোক মারা যান। এরপর ১৯০৭ ও ১৯১১-তে

যথাক্রমে বৃটেন ও আমেরিকায় মোটর রেসের জন্যে নির্দিষ্ট পথ তৈরি হয়। বৃটেনে এই সারকিটগুলির নাম 'ব্রুকল্যান্ডস' আর আমেরিকায় 'ইন্ডিয়ানাপোলিস'। কিন্তু সাবধানতা সত্ত্বেও ১৯৫৫ সালে সেই ১৯০৩-এর মতই আবার একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পিয়েরে লিভিগসের মারসিডিস্ গাড়িটা এত জোরে ছুটছিল যে লিভিগসের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল স্টিয়ারিং আর গাড়িটা ঢুকে পড়ল সোজা দর্শকদের মধ্যে। প্রায় আশি জন মারা যান।

পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক মোটর রেসের নাম, গ্রাঁ-প্রি। ১৯০৬ সালে গ্রাঁ-প্রি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল মূলত ফরাসিদের উৎসাহে। পৃথিবীর প্রথম গ্রাঁ-প্রি প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ৬২ মাইল গতিতে ছুটে যে ফরাসি গাড়িটা প্রথম হয়েছিল তার নাম রেনল্ট। পরের বছর কিন্তু গ্রাঁ-প্রি চ্যাম্পিয়ন হল তোমাদের খুব চেনা নামের গাড়ি, ফিয়েট। ঘণ্টায় ৭০ মাইল জোরে গাড়িটাকে চালিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন ফেলিস নাজ্জারো।

এর পরেই ইওরোপে রেসিং গাড়ি তৈরি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯১২ সালে আরনেস্ট হেনরি নামের ছাব্বিশ বছরের একটি ছেলে এমন এক গাড়ি তৈরি করল যার গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারত। এর আগে এত জোরে গাড়ি চালানোর কথা ভাবাই যেত না। তোমরা জরজেস্ বয়লোর নাম শুনেছ কিনা জানি না, তিনি কিন্তু হেনরির তৈরি গাড়িটা এমনি ঝড়ের বেগে চালাতে লাগলেন যে তাঁকে প্রতিযোগিতায় হারানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। মোটরগাড়ি বিশারদরা অবশ্য হেনরির তৈরি গাড়িটির চেয়েও দ্রুততর গাড়ি তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানিতে তৈরি হল মারসিডিজ-বেনজ। এর গতি ঘণ্টায় ১১০ মাইল পর্যন্ত পৌঁছতে পারত। বয়লো-ই আবার এই মারসিডিজ চালিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন।

রেসিং গাড়ি তৈরিতে জার্মানি যাতে ইওরোপে তার আধিপত্য বজায় রাখে সেদিকে হিটলার বিশেষ নজর রেখেছিলেন। ফলে মারসিডিজ কোম্পানি দুর্দান্ত সব গাড়ি তৈরি করতে লাগল একের পর এক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কিন্তু মোটর রেসে জার্মানির আধিপত্য চলে গেল। ১৯৫০ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় প্রথম হল ইটালি। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মেটামুটিভাবে ইটালিই বারবার জিততে থাকে। ইটালিয়ান গাড়ির সঙ্গে যে দৌড়ে কেউ পারছিল না, তার কারণ এনজো ফেরারি আবিষ্কৃত নতুন নতুন মডেলের রেসিং গাড়িগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবার মত গাড়ি প্রায় ছিলই না বাজারে। ১৯৬৬ সালে ফোর্ড গাড়ির কাছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেরারিকে হারতে হল।

মোটর রেসের দুর্ধর্ষ সব নায়কদের নামের সঙ্গে তোমরা নিশ্চয় অনেকেই পরিচিত। যে গাড়ি যত দ্রুতই ছুটতে পারুক না কেন, চালকের সাহস আর কৃতিত্ব ছাড়া অন্তত গ্রাঁ-প্রি প্রতিযোগিতায় পাত্তা পাওয়া যায় না। ১০০ মাইল জোরে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে মোড় বেঁকতে গেলে ঠিক কী ধরনের দুঃসাহসের প্রয়োজন ভেবে দেখেছ? মনে করো, একটা গাড়ি চলেছে ঘন্টায় ১৫০ মাইল বেগে। সময়টা সন্ধে হয় হয়। কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে সামনের পথ। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সামনের রাস্তাটা অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় নিয়েছে, যেমন দেখেছিলেন ১৯৬৮ সালের একটি জার্মান মোটর-রেসে জিমি ক্লারক। জিমি তাঁর লোটাস গাড়িটাকে মুহূর্তে বেঁকিয়েও নিয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর গাড়ির গতি প্রায় ঘণ্টায় ২০০ মাইল। সুতরাং গাড়ির চাকাটা গেল পিছলে, আর রাস্তার পাশেই ছিল প্রকাণ্ড একটা গাছ। মুহূর্তের মধ্যে জিমির দেহটা তাঁর গাড়ির সঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। জিমি কিন্তু ইতিমধ্যেই পঁচিশটা গ্রাঁ-প্রি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন।

বহু গ্রাঁ-প্রির অপরাজিত নায়ক ব্রুস ম্যাকলারেনকেও মরতে হয়েছিল শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায়। একদিন সকালবেলায় নিজের গাড়িটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে তিনি ক্রমাগত স্পীড বাড়াচ্ছিলেন। পরের দিন কাগজে পড়লাম ব্রুস আর পৃথিবীতে নেই।

১৯৭০ সালে জকহেন রিন্ড গিয়েছিলেন ইটালিয়ান গ্রাঁ-প্রিতে। প্রতিযোগিতার একটু আগে প্র্যাকটিস করে নিচ্ছিলেন তিনি। আন্দাজ করা হয় হঠাৎ কোনো কারণে তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। দুর্ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখুনি। রিন্ডের বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

কিংবা মনে করো অ্যালবার্টো অ্যাসকেরিকে। বেপরোয়া গতিতে ছুটে চলেছে তাঁর 'ফেরারি' গাড়িটা। এমন সময় তাঁর নেকটাইটা কীভাবে উড়ে এসে জড়িয়ে গেল তাঁর চশমায়। পর মুহূর্তে শোনা গেল একটা প্রচণ্ড শব্দ, দেখা গেল একটা আগুনের গোলা আর তার কিছু পরে একটা তালগোল পাকানো গাড়ির মধ্যে অ্যালবার্টোর ভাঙাচোরা দেহটা।

কিন্তু মোটর রেসের সব দুর্দান্ত চালককেই যে এভাবে মরতে হয় তা নয়। জ্যাকি স্টুয়ার্ট, গ্রাহাম হিল, ডেনি হিউম, টনি ট্রিমার, স্টারলিং মস প্রভৃতি বহু গ্রাঁ-প্রির নায়ক আজও অক্ষতভাবে জীবিত। মোটর রেসের নায়িকাদের সংখ্যাও কম নয়। যদিও মারাত্মক গ্রাঁ-প্রি প্রতিযোগিতায় এ পর্যন্ত কোনো মহিলাই নামেননি, র‍্যালি রেসে অনেক মেয়েই খুব নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্যাট মস, অ্যান উইজডাম, রোজমেরি আর প্যাটসি বার্ট। এঁরা প্রত্যেকেই জানেন মোটর রেসের বিপদ ঠিক কতটা। তবু বৃষ্টিভেজা কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট পথে ঘণ্টায় দেড়শ মাইল জোরে গাড়ি চালাবার আকর্ষণ এঁদের কাছে দুর্নিবার।

দুই মা

লীলা মজুমদার

ভারতের তথ্য ও বেতার বিভাগীয় কর্মীদের যে নানা রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হওয়াই স্বাভাবিক, সে তো সহজেই বোঝা যায়। ওরা অনেক সময় যে-সব জায়গায় শিক্ষিত মানুষের চলাচল প্রায় নেই বললেই হয়, ঘন বনের মধ্যে, দুরন্ত নদীর ওপারে, খাড়া পাহাড়ের পেছনে নানারকম দুর্গম জায়গায়, রেকর্ডার ক্যামেরা ইত্যাদি লট-বহর নিয়ে, ভারতের উপজাতীয়দের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে নতুন-নতুন তথ্য নিয়ে আসে। এ-ও সেই ধরনেরই একটা ব্যাপার।

ম্যাপে ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণটা দেখে মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা ঘোড়া, পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ের ওপর দিব্যি মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগে ওদিককার সমস্ত জায়গাটাকেই আসাম বলা হত, এখন ভাগ ভাগ হয়ে, নানান নতুন নাম হয়েছে। সেই রকম একটা অল্প-চেনা জায়গায়, পাহাড়ের পায়ের কাছে উপজাতীয়দের একটি সুন্দর গ্রাম। বড় বড় সেগুন-গাছ, বাঁশ-ঝাড় যেন গ্রামটির সঙ্গে কোলাকুলি করবার জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। দেখলে চোখ জুড়োয়; মনে হয় এমন জায়গায় দুদিন থাকি। গ্রামের নাম হাতিয়া।

কিছুদিন আগেও এরা কোনো বিদেশী লোককে গাঁয়ে ঢুকতে দিত না। বলত, তাহলে ওদের আর কিছু বাকি থাকবে না। ওরা নাকি আর্যরা এ-দেশে আসবার আগে থেকেই ঐ গ্রামে বাস করে। আজকাল ওদের প্রধানের মত নিয়ে কিছু বাইরের লোক গাঁয়ে ঢুকতে পায়। ভারত সরকার ওদের জন্য হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, পাহাড়ের ঝরনা থেকে পাইপে করে জল আনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে, সেবার তথ্য ও বেতারের দলকে ওদের শীত বিদায়ের উৎসবে আসতে অনুমতি দিয়েছিল।

চমৎকার উৎসব। একেবারে অন্য ধরনের। পাহাড়ের পায়ের কাছে রঙিন পাথর দিয়ে বাঁধানো এক গর্ত; গর্তের পাশে সুন্দর কারিকুরি করা কাঠের এক মন্দির; মন্দিরে ঠাকুর দেবতা নেই, কিন্তু চার দেয়াল আর ছাদ জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট খোদাই করা মূর্তি। হাতি-মা'র পাশে বাচ্চা হাতি, মানুষ-মা'র কোলে ছোট্ট ছেলে। পুজো বলেও কিছু নয়। সারি-সারি গাঁয়ের মা মেয়ে ছেলে বুড়ো ঘড়ায় করে দুধ, ডালায় করে ফল, ভাঁড়ে করে মধু এনে থরে-থরে সাজিয়ে দিয়ে গেল। পরে ঘণ্টা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে সেগুলোকে বাঁকে করে ঘন বনে নিয়ে গিয়ে রেখে আসা হল। ফিরে এসে নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ।

তথ্য বিভাগের ছোকরাদের কী দুঃখ; তা অমন ভালো জিনিস বনে ফেলে আসা কেন? নিজেরা না খাবি তো বাইরে থেকে আসা অন্য লোকও তো আছে! উপজাতীয় ছেলেদের একজন জিব কেটে বলল, "ছি ছি, অমন কথা বলবেন না, ও জিনিস হাতিদের কাছে উৎসর্গ করা। ওঁরা খাবেন।"

"তা, ওনারা টের পাবেন কী করে যে খাবার এসেছে?"

"কেন, ঘণ্টির আওয়াজ, গানের সুর কানে গেলেই ওনারা পাহাড় থেকে নেমে আসেন। ওনাদের কান বড় সজাগ।"

"কিন্তু এত জানোয়ার থাকতে হাতিকে কেন খাওয়ানো?" তখন গ্রামের সবচেয়ে বুড়ো অধিবাসী ওদের দুই মায়ের গল্প বলেছিল। এই হল সেই গল্প।

সেকালে হাতির দেশ ছিল ওটা। মানুষে হাতিতে মিলেমিশে বেশ ছিল। তারপর বিদেশী সওদাগররা মোহর দিয়ে হাতি কিনতে এল। গাঁয়ের মেয়েরা মোহর গেঁথে মালা পরে বাহার দিতে লাগল। হাতি ধরার জন্য কায়দা জানত না কেউ, তাই ফাঁদ পেতে হাতি ধরা শুরু করল। কেমন ফাঁদ? না, হাতি চলার পথে গভীর সব গর্ত খুঁড়ে গাছের সরু-সরু ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতিরা টের পেত না। ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ডালপালা ভেঙে গর্তে পড়ত। কী তাদের বিকট চ্যাঁচানি! সেই চ্যাঁচানি শুনে গাঁয়ের লোক দৌড়ে এসে দড়ি-দড়া দিয়ে হাতি বেঁধে ফেলত। সওদাগরদের লোকরা এসে গাছের গুঁড়ি ফেলে গর্ত থেকে হাতি তুলে, গাঁয়ের প্রধানকে টাকা দিয়ে চলে যেত। সে-হাতিরা আর বনে ফিরত না। তখন থেকে হাতিদের সঙ্গে গাঁয়ের লোকদের সদ্ভাব রইল না। কী করে থাকবে? সামনা-সামনি লড়াইয়ের শত্রুকে ক্ষমা করা যায়; কিন্তু যারা লুকিয়ে গর্ত খুঁড়ে ফাঁকি দিয়ে শত্রু ধরে, তাদের কখনো ক্ষমা করা যায়?

আমি এখন ছোট...

আমিও তো বড় হবো

বড় হ'য়ে বইটই প'ড়ে, লেখাপড়া শিখে আমিও বাবার মত কাজকর্ম করবো। আমার বাবাও তো ছোটবেলা থেকে তাই করেছে···আজ আমাদের বাড়ি···গাড়ি। দিদির মত আমিও কলেজে পড়বো। তারপর দিদির বিয়ে। সে কী মজা, কত হইচই। তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারছি না।

আপনার ছেলের লেখা-পড়া, মেয়ের বিয়ে, নিজেদের অবসর-জীবনের সংস্থান··· এ সব কিছুরই ব্যবস্থা করার মত নতুন নতুন সঞ্চয় প্রকল্প আজ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব পালন অনেক সহজ করেছে। আমাদের 'ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট' এই রকমই একটি সঞ্চয় প্রকল্প।

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট প্রকল্প

★ মাসে ৫০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ২০,৯০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৩৮,৩০০৲।

★ মাসে ১০০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ৪১,৮০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৭৬,৬০০৲।

এছাড়া এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

অথবা যে কোন শাখা অফিস।

চেয়ারম্যান: শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB-32/77

গাঁয়ের লোকদের এতকাল এক শত্রু ছিল, পাহাড়ের কালো বাঘ। এখন হল দুই শত্রু: কালো বাঘ আর বনের হাতি। হাতি তাড়াবার জন্য ক্ষেত পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে জানান দেওয়া হত—হাতি আসছে। অমনি সব মশাল জেবলে বর্শা হাতে তৈরি হত।

কিন্তু কালো বাঘ আসত জানান না দিয়ে, অন্ধকারের সঙ্গে গা মিলিয়ে। তাকে কেউ ঠেকাতে পারত না। একদিন শীতের শেষে ঘরের দোর-জানলা খুলে লোকে বসন্তের হাওয়াকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এমন সময় রাত-দুপুরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠল; হাতির পাল দেখা দিয়েছে! অমনি যেখানে যত পুরুষ-মরদ ছিল, সব ছুটল হাতি ঠেকাতে, নইলে শীতের ফসল আর দেখতে হবে না।

সেই ফাঁকে কালো বাঘ এসে প্রধানের পাঁচ মাসের ছেলেকে গায়ে জড়ানো কাঁথাসুদ্ধ তুলে নিয়ে দে ছুট। ছেলের মা-দের পাতলা ঘুম হয়, অমনি জেগে বাঘকে দেখতে পেয়ে, বাইরে থেকে জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে 'লখিয়া রে-এ-এ!' বলে ডাকতে-ডাকতে প্রধানের বৌ বাঘের পিছনে ছুটল। ঘরে আর কেউ নেই। পাড়ার মেয়েরা টের পেলেও, নিশ্চিত মরণের দিকে কেউ দৌড়ে এল না।

বনের দিকে ছুটল বাঘ। বনে ঢুকেই হাতি-চলার পথ। সেখানে ফাঁদ; ফাঁদের ডাল-পালা ভাঙা; ফাঁদের মধ্যে হাতি পড়েছে। বাচ্চা-হাতি। ভিতর থেকে সে মানুষের ছেলের মতো কাঁদছে; ওপরে ছায়ার মতো তার মা গর্তের চারদিকে পাগলের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে! বাঘ তার পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

চোখের কোনা দিয়ে দুই মা দুজনকে দেখল। অমনি বাজের মতো বিকট আওয়াজ করে মা-হাতি বাঘের পিছনে বিদ্যুতের বেগে দৌড়ল। গর্তে ছানা পড়ে রইল। তারপরেই বন ফাটানো আর্ত-নাদ। ছেলেটাকে শুঁড়ে করে মা-হাতি ফিরে এসে প্রধানের বৌয়ের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে গর্তের কিনারায় চুপ করে দাঁড়াল। কাঁথা-জড়ানো ছেলের গায়ে আঁচড়টি পড়েনি।

ছেলেটা সেইখানে পড়ে তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল, প্রধানের বৌ তরতর করে ফাঁদের ধারে কাটা খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে নীচে নেমে গেল। হাতির ছানা বেজায় ভয় পেয়েছে, কিন্তু ব্যথা লাগেনি। তবে গর্ত থেকে তাকে তোলা দরকার। বৌ আবার ওপরে উঠে এসে মাঝারি দেখে দুটো গাছের গুঁড়ি আড়ভাবে গর্তে ফেলল। সিঁড়ির মতো গুঁড়ি দুটি কাত হয়ে রইল। তার-পর বৌ আবার নেমে গিয়ে বাচ্চাটাকে ঠেলেঠুলে গুঁড়ি বেয়ে ওপরে তুলল। নিজেও লাথি-ঠোক্কর কম খেল না।

ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। হাতির পাল তাড়িয়ে প্রধান ঘরে এসে দেখে চারদিকে বাঘের থাবার দাগ। তার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। দড়ি-দড়া, দা-কুড়ুল লোকজন নিয়ে সে-ও বনে ঢুকল। বনে ঢুকে ফাঁদের কাছে পৌঁছে কেউ রা কাড়ে না! হাতির ছেলে হাতির মায়ের দুধ খাচ্ছে আর হাতির পায়ে ঠেস দিয়ে বসে প্রধানের বৌ তার ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। দা-কুড়ুল ফেলে দিয়ে গাঁয়ের লোকরা হাত জোড় করে বনের দিউকে কৃতজ্ঞতা জানাল।

প্রধানের বৌ ছেলে-কোলে উঠে দাঁড়াল। হাতি-মা তার ছেলে নিয়ে বনে গেল। প্রধান তখুনি ফাঁদের গর্ত বুজিয়ে ফেলল। সওদাগরদের ভাগিয়ে দিল। আর কখনো এ-দিককার লোক হাতি ধরেনি।

সেই ইস্তক প্রতি বছর শীতের শেষে ক্ষেতের ফসল পাকলে, হাতিদের নৈবেদ্য দেওয়া হয়, সে কি খুব অন্যায় হয়?

ছবি তুলে, গান রেকর্ড করে, এরাও খুব খুশি। সবাই বলল "না, কখনো না।"

ছবি সুনীল শীল

গুরুশিষ্য। বি ভি চ্যাটার্জী ও চুনী

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

একটাও কথা না বলে বাবা গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকলেন। তারপর পেন্সিল-কাটা ছুরি হাতে বেরিয়ে এসে আমাদের খেলার বলটা টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেললেন, বলের প্যানেলের পাশের সেলাই বরাবর ছুরি চালিয়ে। দাদা পড়ার ঘরে ঢুকে গুম হয়ে বসে রইল। আমি কাঁদতে কাঁদতে চল গেলাম মা'র কাছে। আমার বয়স তখন আট, দাদার এগারো।

ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো? সকাল বেলা। তখন পড়ার সময়। বাবা তাঁর ঘরে বসে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমরা লেখাপড়া ছেড়ে দুভাই তাঁর ঘরের পাশের ফালি জায়গাটায় বল পেটাপেটি করছিলাম। তাতেই বাবা ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন।

এমনিতে বাবা ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ এবং শান্ত মানুষ। আমাদের খেলাধুলায়ও উৎসাহ দিতেন। বল তো তিনিই কিনে দিয়েছিলেন। আমরা হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিলাম। অনেকদিন বল নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাদের সেই স্বপ্নের ধন বাবা এমন ফালা-ফালা করে ফেলেছিলেন যে, মুচিকে দিয়ে সেলাই করানোর উপায়ও ছিল না। মা আবার বাবার পক্ষ নিয়েছিলেন বলে আমাদের আরও দুঃখ হয়েছিল।

মা বলেছিলেন, "তোমরা দুটো অন্যায় করেছ। পড়ার সময় পড়তে না বসে খেলা শুরু করেছ। আর উনি যখন ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছেন তখন ওঁরই ঘরের পাশে খেলতে খেলতে গোলমাল করেছ। এতে তোমাদের সম্পর্কে ভদ্রলোকদের কী ধারণা হল বলো তো?"

তখন ও-কথা শোনার মতো মন ছিল না। বুদ্ধি বা বিবেক ছিল না। বলের শোকটা এত বড় হয়ে উঠেছিল যে, মা'র কথা আমাদের তখন ভালও লাগেনি। বেশ কয়েকদিন মন-মরা হয়ে কাটিয়েছিলাম। ঘটনাটি কিন্তু আমাদের মনের উপর বড় একটা দাগ কেটেছিল। তাই পরে অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার সময় খেলা-ধুলো করিনি, যদিও আর একদিন খেলার জন্যই বাবার কাছে মার খেয়েছিলাম। ওই একদিনই।

আমার বাবার নাম প্রমথনাথ গোস্বামী। নিয়ম নিষ্ঠা এবং আমাদের লেখাপড়ার প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নিজে ছিলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের কৃতী ছাত্র। আই এ এবং বি এ, দুই পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হয়েছিলেন। আমার দাদু ছিলেন সংস্কৃতে মহাপন্ডিত এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ্। নাম মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সরস্বতী। নাম শুনলে এখনও তাঁর ছাত্ররা ভক্তিতে মাথা নত করেন। তিনি ছিলেন গৌহাটি কটন কলেজের প্রিন্সিপাল। আমার আর এক দাদু (বাবার মামা) যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন অর্থনীতির মস্ত পন্ডিত। বহুদিন আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এবং কিছুদিন যুগান্তর পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে পারিবারিক এই পরিবেশই হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাবাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। আর্থিক দিক দিয়ে বাবা যে খুব সচ্ছল ছিলেন তা নয়। ইস্টার্ন রেলওয়েজে অডিট-অফিসার ছিলেন। কিন্তু, সংসারে দায়দায়িত্ব ছিল অনেক। তাছাড়া দেশ বিভাগের পর ঘরবাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে বেশ একটু ভেঙে পড়েছিলেন। তাই আমরা যাতে পড়াশুনায় মনোযোগী হই, কুসংসর্গে না পড়ি, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সেদিকে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু আগেই বলেছি, খেলাধুলোর বিরোধী ছিলেন না। নিজেও খেলা ভালবাসতেন।

আমাদের আদি বাড়ি ছিল ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার যশোদল গ্রামে। পূর্ববঙ্গে জন্মেছি বলে অনেকে এখনও আমাকে বাঙাল বলে ঠাট্টা করে। বেশি করে আমার পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুবান্ধবরাই। পূর্ববঙ্গের কোনো স্মৃতিই কিন্তু আমার মনে নেই। বাবা যখন কলকাতায় চলে আসেন তখন আমার বয়স মাত্র চার বছর। আমি বেড়ে উঠেছি পশ্চিমবঙ্গের জলহাওয়ায়। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই আমার ফুটবলের পায়ে খড়ি, লেখাপড়ায় হাতে খড়ি।

না আমি কোনোদিন বাতাবি লেবু নিয়ে ফুটবল খেলিনি। টেনিস বলে অবশ্য খেলেছি। প্রথম খেলেছি আমার দাদা মানিক গোস্বামীর সঙ্গে পরে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে।

ছেলেবেলা থেকেই খেলার উপর আমার ভীষণ আগ্রহ। আমরা থাকতাম বালিগঞ্জের ডোভার লেনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্সে। সুযোগ পেলেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বল পেটা-পেটি শুরু করে দিতাম। আস্তে আস্তে আমরা বড় হতে লাগলাম। বলের সাইজও বড় হতে লাগল। দাদা ও আমি পড়তাম তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে। স্কুলের পরে এবং ছুটির দিনে সকালে সকালে বল নিয়ে চলে যেতাম দেশপ্রিয় পার্কে, দল ভাগাভাগি করে খেলতে। অল্প দিনের মধ্যে স্কুলে এবং পাড়ায় আমরা 'মানিক-চুনী' নামে পরিচিত হয়ে উঠলাম।

কিছুদিন পরে অনেকের কাছে নাম দুটো একটা হয়ে গেল। কেউ কেউ ভাবত, মানিকচুনী বুঝি একজনেরই নাম।

দাদা আমার চাইতে তিন বছরের বড়। ছেলেবেলায় খুবই ভাল খেলত দাদা। বড় হয়েও নাম করেছিল। প্রথম ডিভিশন টিম স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও মোহনবাগানের রাইট আউটে খেলেছে। পরে খেলেছে ব্যাকে। মোহনবাগানের সঙ্গে দূর-প্রাচ্যেও সফর করেছে। আমার খেলা শেখার পেছনে রয়েছে দাদার বিরাট ভূমিকা। দাদা সব সময় আগলে রাখত আমাকে। দাদার ভাল নাম সুনির্মল, আমার সুবিমল। কিন্তু পোশাকি দুটি নামই তো ফুটবলের হাওয়ায় উড়ে গেছে।

কীভাবে উড়ে গেল?

১৯৪৬ সালের কথা। আমার সেই আট বছর বয়সের আর এক ঘটনা। আমরা, পাড়ার ছেলেরা দুই দলে ভাগ হয়ে খেলছি দেশপ্রিয় পার্কে। দাদা এক দলে, আমি আরেক দলে। সকলের পায়ের জুতো জড়ো করে মাঠের দুদিকে গোল পোস্ট বানানো হয়েছে। দুই দলে শুরু হল জোর খেলা। হঠাৎ একটা বল পেয়ে তিন চারজনকে কাটিয়ে আমি একটি শট করতেই জুতোর

গোলপোস্ট ভেঙে বল ঢুকে গেল গোলে। গো-ও-ল বলে আনন্দে আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমাদের দলের আর সবাইও চিৎকার করতে করতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। দাদা ছুটে এসে বলল, "না, গোল হয়নি।"

ওদের দলের আর সবাইও দাদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করল।

আমি বললাম, "আলবত গোল হয়েছে।" দাদার যুক্তি—"যদি গোলপোস্ট থাকত নিশ্চয়ই পোস্টে লেগে বল ফিরে আসত। সুতরাং গোল হতে পারে না।"

আমি বললাম, "জুতোই যখন গোলপোস্ট এবং জুতোসমেত বল যখন গোলে ঢুকেছে তখন নিশ্চয়ই গোল।"

গোল নিয়ে গণ্ডগোল আর থামে না। অনেকক্ষণ ধরে কথা কাটাকাটি চলল। শেষ পর্যন্ত মারামারি বাধার উপক্রম। এমন সময় বেশ লম্বাচওড়া এক ভদ্রলোক আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ তিনি গোলের পেছনের বেঞ্চিতে বসে সব দেখছিলেন, আর বাঁধানো সোনার দাঁত বের করে মিটি মিটি হাসছিলেন। বিবদমান দুই পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি সকলকে শান্ত হওয়ার উপদেশ দিয়ে রায় দিলেন : শটটি খুব চমৎকার হয়েছে, কিন্তু গোল হয়নি।

শটের প্রশংসায় আমার মন নরম হল না। আমি গোঁ ধরে বসেছিলাম—গোল মঞ্জুর করতেই হবে। বললাম, "আপনার কথা আমরা মানব কেন? আপনি বললেই হল?"

ইতিমধ্যে বেশ ভিড় জমে গেছে। আমাদের দলের দু'তিনজন বন্ধু সমর্থক বলল : যাক্‌গে, উনি যখন বলছেন, ছেড়ে দে।

আমি বললাম, "ছাড়ব কেন? কে উনি?"

এক বন্ধু বলল, "জানিস না? উনিই হচ্ছেন বিখ্যাত খেলোয়াড় বি ডি চ্যাটার্জি। এখন মোহনবাগান ক্লাবের ও ভারতীয় দলের ফুটবল কোচ। একজন বড় রেফারিও।"

আমি আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। বলাইদা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তুমি তো সুন্দর খেল। আমি তোমাকে খেলা শেখাব।"

আগেই লিখেছি, এটা ১৯৪৬ সালের কথা। ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কার ঘটনা। তখন ময়দানে খেলা বন্ধ ছিল বলে বলাইদা দেশপ্রিয় পার্কে বসে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ছোট ছেলেদের খেলা দেখতেন। খুঁজতেন আগামী দিনের খেলোয়াড়।

বলাইদার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় এবং বলতে গেলে সেইদিন থেকে চুনী গোস্বামীর খেলোয়াড়-জীবনের সূচনা। সেইদিন থেকেই বলাইদা আমার শিক্ষাগুরু এবং অভিভাবকের মতো হয়ে উঠলেন। তাঁরই হাত ধরে পরে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে আমার প্রবেশ। বলাইদা আজ বেঁচে নেই। খেলতে খেলতে বহু মানুষের ভালবাসা পেয়েছি। কাদামাখা জার্সি গায়ে দিয়েও দেশ বিদেশে পেয়েছি বহু জ্ঞানীগুণী ও রাষ্ট্রনায়কের উষ্ণ সান্নিধ্য। জীবনের বড় সাফল্যের রঙীন দিনগুলিতে বলাইদার কথাই আমার বারবার মনে পড়েছে।

এখন আমার হাইট ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। ছেলেবেলায় কিন্তু বয়স অনুপাতে আমি আকারে ছোট ছিলাম। একজন বড় খেলোয়াড় তো আমাকে বামন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তখন আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র। কলেজ টিমের হয়ে খেলতে গিয়েছিলাম পূর্ণিয়ায়। আমাদের বিপক্ষে খেলেছিলেন অমল মজুমদার, যিনি চল্লিশের দশকে মোহনবাগানে খেলে বেশ নাম করেছিলেন। ২২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচাইতে ছোট চেহারার। আমার গোলেই কলেজ টিম জিতেছিল এবং খেলার সময় প্রচুর হাততালি পেয়েছিলাম। খেলার পরে অমল মজুমদার আমাদের কলেজ টিমের ম্যানেজারকে বললেন, "ছেলেটি কি বামন? নাকি, বয়স কম? যদি বামন হয় তবে খেলায় আর বেশিদূর এগোতে পারবে না। আর যদি সত্যিই বয়স কম হয়, তাহলে অসাধারণ এক খেলোয়াড় হবে।"

ম্যানেজার বললেন, "চুনীর বয়স সত্যিই কম, তবে বয়স অনুপাতে ওকে আরও ছোট দেখায়।"

আর একবার। তখনও আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র। বি এ ফাইনাল ইয়ারের। বর্ধমান থেকে এক কলেজের অধ্যাপক দু'তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমি তখন বারান্দায় বসে পড়ছি। বললেন, "চুনী গোস্বামীকে একটু ডেকে দাও।"

বললাম, "তার সঙ্গে কী দরকার?"

ওঁরা বললেন, "তাকে ডেকে দাও না। তার সঙ্গেই কথা বলব।"

আমি বললাম, "আমিই চুনী।"

ওঁরা বিস্মিত হয়ে আমাকে ভাল করে দেখতে লাগলেন। কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না আমার কথা। বিশ্বাস করলেন তখন, যখন আমার দাদা এসে বলল, "ওঁরা কাকে চাইছেন রে চুনী?"

তারপরে ওঁরা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে আরম্ভ করলেন, "একে দিয়ে হবে না।" ততক্ষণে ব্যাপারটা আমরা জেনে ফেলেছি। ওঁরা এসেছিলেন একটি ফুটবল ম্যাচের ফাইনালে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে।

বয়স্ক অধ্যাপক আমাকে আদর করে বললেন, "তুমি এত ছোট! বেঁচে থাক বাবা, খেলায় আরও উন্নতি করো।"

আমার সম্বন্ধে বাবার সঙ্গেও দুচারটি কথা বললেন। ভদ্রলোকরা দূর থেকে এসেছেন, সেই জন্য আমার বর্ধমান যাওয়ার ব্যাপারে বাবার খুব একটা আপত্তি ছিল না। কিন্তু ওঁরাই আমাকে বাতিল করে চা খেয়ে ফিরে গেলেন। বললেন, "লোকে বিশ্বাস করবে না। বলবে, নকল চুনীকে ধরে এনেছে। আমরা কি শেষে মার খাব?"

আগে কলকাতার প্রায় সব পাড়াতেই অল্পবিস্তর ফাঁকা জায়গা ছিল। সেই সব জায়গায় নির্দিষ্ট উচ্চতাবিশিষ্ট খেলোয়াড়দের জন্য ফুটবল প্রতিযোগিতা হত। সাড়ে চার ফুট, চার ফুট আট ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি, পাঁচ ফুট—এমনি হাইটের সব বাচ্চা খেলোয়াড় নিয়ে গড়া দলগুলি ওই সব প্রতিযোগিতায় খেলত। আমি প্রচুর ডাক পেতাম। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় এবং মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে এত অনুরোধ আসত যে, কোন কোন দিন আমাকে তিন চারটি খেলাতেও যোগ দিতে হত।

কোনো ম্যাচে হাফটাইম পর্যন্ত, কোনো ম্যাচে মাত্র ১০ মিনিট, আবার কোনো ম্যাচে ১৫ মিনিট খেলতে হত। খেলতে খেলতে অপবাদ রটে গেল, আমি নাকি প্রোফেশনাল। দশ মিনিটের জন্য আট আনা, এবং প্রতি গোলের জন্য আট আনা চারজ করি। শুনে আমার হাসি পেত।

ছোটদের সবচাইতে জমকালো ফুটবল আসর বসত উত্তর কলকাতায় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বাড়ির মাঠে, যে বাড়িতে এখন ইউনিভার্সিটির পোস্ট গ্রাজুয়েট হোস্টেল। মহারাজা শ্রীশ নন্দী নিজেই ওই প্রতিযোগিতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফাইনাল খেলায় সভাপতিত্ব করতেন বাংলার রাজ্যপাল। কী একটা বিশেষ কাজের জন্য রাজ্যপাল আসতে পারলেন না। সেবার আমাদের বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট দল ফাইনালে জিতল এবং আমি পেলাম বেস্ট প্লেয়ার ও হাইয়েস্ট স্কোরারের পদক।

সম্ভবত মহারাজা শ্রীশ নন্দীর কাছ থেকে রাজ্যপাল আমার

সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলেন। তখন রাজ্যপাল ছিলেন ডঃ কৈলাস-নাথ কাটজু। রাজভবনের মাঠে এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলার জন্য তিনি আমন্ত্রণ করলেন আমাদের বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট এবং আমাদের কাছে ফাইনালে হেরে যাওয়া দলটিকে। আমার কাছেও এল রাজভবনের মোহর-আঁটা এক নিমন্ত্রণপত্র। চিঠি পেয়ে যেমন আনন্দ হল, ভয়ও পেলাম তেমনি। কোনোদিনই লাটসাহেবের ওই বিরাট বাড়ির গেটের মধ্যে তো ঢুকিনি। আগে শুনেছি লাটকুঠির সব গেটের পাশেই কামান থাকত। কামানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত সারি-সারি পুলিস। দক্ষিণ দিকের গেট, যেখানে এখনো লম্বা দুটি টিনের ছাউনি আছে তার নীচে দুই সেপাই মস্ত দুটি ঘোড়ায় চড়ে দিনরাত গেট পাহারা দিত। সেপাইদের জামার হাতায় ও বুকে থাকত বড় বড় পেতলের বোতাম, মাথায় ঝালরওয়ালা লম্বা পাগড়ি, হাতে বল্লম। আরও কত কথাই তো শুনেছিলাম লাটসাহেবের বাড়ি সম্পর্কে। সেই বাড়ির মাঠে খেলতে ভয় হয় না, তোমরাই বলো? তারপর শুনেছিলাম খেলা দেখবেন স্বয়ং রাজ্যপাল। উপস্থিত থাকবেন অনেক মন্ত্রী। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি।

যেদিন খেলার কথা তার আগের দিন আর একটি খেলা ছিল। জলবৃষ্টির মধ্যে খেলতে হয়েছিল বলে সেই খেলায় আমাদের জার্সি জুতো একেবারে ভিজে গিয়েছিল। আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। ভয় হল, পরের দিন জার্সি জুতো শুকুবে তো? রাজভবনে আমরা খেলতে যাব জেনে মা-বাবাও খুব খুশি হয়েছিলেন। ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে মা আমাদের জার্সি দুটো তার নীচে মেলে রাখলেন একটি দড়ি টানিয়ে। বাবা কী করলেন জানো? স্টোভ জ্বালিয়ে তার উপর টোস্টার চাপালেন। আমরা ভাবলাম, বাবা বোধহয় আমাদের জন্য কোন খাবার বানাবেন। খেলে এসেছি তো। কিন্তু কোথায় খাবার! আমাদের দু ভাইয়ের দু জোড়া জুতো চাপিয়ে দিলেন টোস্টারের উপর। মা হাঁহাঁ করে উঠলেন। বুঝতেই পারছ ভটচার্যি বাড়ির মেয়ে, গোস্বামী বাড়ির বউয়ের কাছে টোস্টারের উপর জুতো চাপানো কত বড় অনাচার। শেষ পর্যন্ত এক ফন্দি এঁটে জুতোয় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে আগুনের আঁচে দুজোড়া জুতোই শুকিয়ে নেওয়া হল। বাবা সেই যে বল কেটে ফেলেছিলেন তার বছর দুই পরের ঘটনা এটা! সেদিন ভালভাবেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম,

রাজ্যপাল শ্রীকাটজুর ডাইনে বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের ক্যাপটেন চুনী

চুনী (বসে, ডাইনে) ও তার বন্ধুরা। চুনীর বয়স তখন আট-ন বছর

মায়ের সঙ্গে চুনী ও মানিক

মানিকজোড়। মানিক ও চুনী

অন্যায় করেছিলাম বলেই বাবা বল কেটে ফেলেছিলেন। যাই হোক আমরা সুন্দরভাবে সেজেগুজে রাজভবনে গেলাম।

মাঠের সব জায়গা সমান। নরম, সবুজ, কী চমৎকার মাঠ। খেললাম যেন ভেলভেটের ওপর। রাজভবনে ঢুকে প্রথমটায় বেশ ভড়কে গিয়েছিলাম। খেলার সময় কিন্তু ভাল খেলব এই কথাটা ছাড়া আর কিছু মনে ছিল না। আমিই ছিলাম দলের ক্যাপটেন। আমরাই জিতেছিলাম এবং আমি পেয়েছিলাম বেস্ট প্লেয়ারের স্বীকৃতি। খেলা দেখে রাজ্যপাল ভারি খুশি। খেলার পর ছোট একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমাকে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল একেবারে রাজ্যপালের পাশে।

ডঃ কাটজু ইংরেজিতে নানা প্রশ্ন করছেন। আমি মাথা নেড়ে যাচ্ছি। আমি তো ইংরেজি স্কুলে পড়তাম না। তাই ইংরেজি কথা কিছুটা বুঝতে পারলেও বলতে পারতাম না। তিনি বললেন, "তুমি কথা বলছ না কেন?" বললেন সেই ইংরেজিতেই।

আমি বললাম, "আমি ইংরেজি জানি না।" তাই না শুনে হো হো করে হেসে উঠে তিনি বললেন, "ইংরেজি তুমি ভালই জান। না হলে মাথা নেড়ে আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিচ্ছ কী ভাবে?"

পরের বছর আবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা। কাশিমবাজার রাজবাড়িতেই। বললেন, "চুনীর ইংরেজি কী বলো তো?"

আমি বললাম, "রুবি বা এমারেল্ড।"

রাজ্যপাল বললেন, "আমি তোমার নাম রাখলাম ডায়মন্ড।" বলেই শিশুর মতো হেসে উঠলেন তিনি। সত্যি, বড় ভাল মানুষ ছিলেন রাজ্যপাল। ছোটদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি।

(ক্রমশ)

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

আন্তঃমণিমেলা কুচকাওয়াজ ও সমবেত ব্যায়াম প্রতিযোগিতা গত ২ অক্টোবর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল : কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম—সপ্তর্ষি মণিমেলা; দ্বিতীয়—অনিন্দিতা মণিমেলা; তৃতীয়—সোনালী মণিমেলা; শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী—শ্রীসজল ঘোষ (সপ্তর্ষি মণিমেলা)। সমবেত ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় প্রথম—ইউনিক পার্ক মণিমেলা; দ্বিতীয়—যাদবপুর কলোনি মণিমেলা; তৃতীয়—বৈশাখী মণিমেলা; শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী—লতিকা রায় (পল্লী মণিমেলা)।

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রিত শাখাকেন্দ্রগুলি ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালন করে। এই দিনটি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, সাফাই অভিযান ও সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

মণিমেলাগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে।

আঞ্চলিক সংবাদ

উত্তর বাংলার মণিমেলাগুলির জন্য সম্প্রতি রায়গঞ্জে সপ্তাহব্যাপী এক শিক্ষণশিবির অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মণিমেলাগুলির জন্য এক খো-খো প্রশিক্ষণ-শিবির সম্প্রতি সমাপ্ত হল। বনগাঁ আঞ্চলিক শিক্ষণশিবির গত ৩ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

বনগাঁ আঞ্চলিক আন্তঃমণিমেলা খো-খো প্রতিযোগিতা সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। ফলাফল : প্রথম—সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলা; দ্বিতীয়—প্রভাত মণিমেলা; তৃতীয়—শরৎস্মৃতি মণিমেলা; চতুর্থ—সীমান্তিকা মণিমেলা।

পরিসন্দেশ

আসানসোলের রেলপার মণিমেলার বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি পালিত হয়েছে। হাওড়ার স্বামীজী মণিমেলার প্রতিষ্ঠা উৎসব বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। হুগলীর আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলার বার্ষিক উৎসব ২৩ আগস্ট পালিত হয়। বিষড়ার শিশু মৈত্রী মণিমেলার বার্ষিক উৎসব ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর উদযাপিত হল। কলকাতার রবীন্দ্রপল্লী মণিমেলার বার্ষিক উৎসব পালিত হল। মেদিনী-পুরের ঘাটাল মণিমেলার বার্ষিক উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে।

নবদ্বীপের বিদ্যার্থী মণিমেলা গত ১ সেপ্টেম্বর 'সাগর থেকে আকাশ' অভিযানের নেতা স্যার এডমন্ড হিলারিকে অভ্যর্থনা জানায়। ২৪ পরগনার পারতলা সারথি মণিমেলার এক ব্রতচারী শিক্ষণশিবির অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের চিনাকুড়ি কোলিয়ারির উদয়ন মণিমেলা সম্প্রতি বার্নপুরে এক ক্রীড়া প্রদর্শনীর আয়োজন করে। শ্যামনগরের নতুন পল্লী কিশলয় মণিমেলা আয়োজিত শিক্ষণশিবিরটি শেষ হয়েছে সম্প্রতি। পশ্চিম বরিষার বৈশাখী মণিমেলা সম্প্রতি এক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিবেষণ করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

মেদিনীপুরের ঘাটাল মণিমেলা মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের আমন্ত্রণে বীরসিংহ গ্রামে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বার্নপুরের আনন্দ মণিমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। বেহালার ইউনিক পার্ক মণিমেলা বর্ষামঙ্গল উৎসব উদযাপন করে। যাদবপুরের রাজাপুর মিলনী মণিমেলা সম্প্রতি এক লোকনৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ২৪ পরগনার নতুন পল্লী কিশলয় মণিমেলা সম্প্রতি নজরুল সন্ধ্যা পালন করে। শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলা সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সুন্দর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বর্ধমানের চিনাকুড়ি কোলিয়ারির উদয়ন মণিমেলার ভাই-বোন ও কর্মীরা সম্প্রতি চারদিনের জন্য মহাকেন্দ্র কার্যালয় থেকে কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে গেল। কলকাতার কসবা মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যা-লয়ের ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে। জগদ্দলের নবমিতালী মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি কলকাতায় এক শিক্ষাভ্রমণে এসেছিল।

ভুতুড়ে গাড়ি

হক—শিল্প প্রতিষ্ঠান
পাহারাদার পুলিসের গাড়ির মত প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগল ওই খুদে গাড়িটা
মিঃ হক...
53
53

স্যার, এই কাগজটায় একটা সই করে দিতে হবে...

হকের গাড়ি-চুরির ব্যাপারটা কিছু না জেনে মিসেস স্টেইনমেৎস্ বাজারের দিকে চললেন।
টম্যাটো... সসেজ... রাই... রুটি...

অ্যালেজো হক্, কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়...
মিঃ হক্, গাড়িটার হদিশ পেয়েছি আমরা। ধাওয়া করছি ওটার পিছনে!
ভেঙে চুরমার করে দাও!
53

হার্বি ঠিক আঁচ করতে পারল যে, তিনটে গাড়ি তার পিছু নিয়েছে।
গুঁড়ো সাবান...স্ট্রবেরি... জ্যাম্...
53
53

Hotel Palace
HOTEL PALACE
HOTEL PALACE
53
53
6-16

53

ওঃ হার্বি! তোর এটা শর্টকাট্ রাস্তা, না?
HOTEL PALACE
HOTEL PALACE
53
53
পাতা ওল্টাও

ওদিকে অ্যালেগ্রো হক, কিন্তু তার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে...
আ-চ্ছা! ওই মেয়েটা আর আমার বেয়াদপ ভাগ্নেটি ওই বিদঘুটে গাড়িটা চেপে যাচ্ছে!

পেছনে ধাওয়া করো!

হ্যাঁ, আর দেখ, ওরা যেন সন্ধের আগে ওই বুড়ির বাড়িতে না ফেরে! বুঝলে?
ঠিক

সমুদ্রতীরে...
ঠাকুমা তো সবসময়েই বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের এই সৌন্দর্য চম-ৎকার!
হ্যাঁ, আজ বিকেলে তো খুবই চমৎকার!
53
53

কিন্তু, এবার তাদের বড় রাস্তায় ওঠবার পথ একেবারে বন্ধ!
53
53

দরকার বুঝে হার্বিও দিল মস্ত একটা লাফ...
আরেব্বাস্!
53

আরে! একটা হাঙর!
!
6-23

সমুদ্রতীর বরাবর মাইলখানেক যাওয়ার পর...
হার্বির যেন কীরকম তাড়া লেগেছে...
53
53

ওদিকে বাড়িতে — কাঁদো-কাঁদো মুখে মিসেস স্টেইনমেৎস্ ওদের ফেরার অপেক্ষায় বসে...
! !
ও-ওরা তো হকের মস্ত বড় একটা ট্রাক নিয়ে এসে হাজির হয়েছে! আর ঠেকানো যাবে না!
(এর পর আগামী সংখ্যায়)

অকুতোভয়ে দুচারটে ভুল

কুম্ভক

রুবেন্সের ছবি দেখেছ তুমি, কাকু?

নন্তুর জ্ঞান দেখে চমকে যাই। রুবেন্স? জিজ্ঞেস করি: ও-নাম তুই কোথায় শুনলি?

পড়েছি এক জায়গায়। এবার তো তাঁর জন্মের চতুর্শত-বার্ষিকী?

কী বার্ষিকী?

চতুর্শতবার্ষিকী, পড়েছি যেন কোথায়।

চতুর্শত? চতুর তো বেশ! রুবেন্সের কথা থাক। আগে শুনি তো, চতুর্শত হল কী করে?

এই রে! ব্যাকরণের ভুল হল বুঝি? তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না সত্যি।

ঠিক আছে। তাহলে তোর সঙ্গে আর নয়, টুম্পিকেই বলি। বল তো টুম্পি চতুর্শত মানে কী?

চারশো-টারশো হবে বোধ হয়।

বোধহয় নয়, তা-ই। কিন্তু কথাটা কী? চতুঃ শত, এই তো? যেমন চতুঃ দশ থেকে হল চতুর্দশ, এই তো?

তাই তো। নন্তু আবার এগিয়ে আসে: তাহলে ভুলটা করলাম কোথায়?

ভুলটা করলি শ-এর মাথায়। এই হচ্ছে বিসর্গের মস্ত মুশকিল। সন্ধি করতে গেলেই হাজারটা গোলমাল এসে চেপে ধরে। সন্ধিতে প্রায়ই একটা রেফ এসে যায় বটে, তার মানে কিন্তু এ নয় যে সব জায়গাতেই বিসর্গের বদলি হবে রেফ। অন্তঃ তলে সে কি আর অন্তর্তলে? সে তো হবে অন্তস্তলে। যদিও, অন্তঃগত নিশ্চয়ই অন্তর্গত।

টুম্পি বলে: এরও কি কোনো নিয়ম আছে কাকু?

আছে বই কী খানিকটা। চ ছ বা ট ঠ বা ত থ যদি পরে থাকে তাহলে কোনো ঝামেলাই নেই। তাহলে কোনো-একটা স হবে বিসর্গের জায়গায়।

কোনো-একটা স? তার মানে কী?

মানে, শ-ষ স তিনটে আছে না? তার মধ্যে কোনো-একটা হবে।

কোনটা তা বুঝব কেমন করে?

বল তো কেমন করে বুঝবি? একটু ভেবে বল। মনে নেই যার যার তার তার? আর এটাও মনে রাখবি যে চ ছ-এর উচ্চারণ হয় তালুর সঙ্গে জিব ঠেকিয়ে, ট ঠ-তে লাগে মূর্ধা, আর ত থ-এর উচ্চারণ হল দাঁত ঘেঁষে।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তালব্য তো তালব্যকেই নেবে, তাই না? তার মানে চ ছ থাকলে বিসর্গ হবে তালব্য শ; ট ঠ থাকলে বিসর্গ হবে মূর্ধন্য ষ; আর ত থ হলে দন্ত্য স। ঠিক?

ঠিক। সেইজন্যেই নিঃ চল নিশ্চল ধনুঃ টংকার ধনুষ্টংকার, আর দুঃ তর দুস্তর। এ-রকম আরো উদাহরণ খুঁজে পাবি অনেক।

এর সঙ্গে চতুর্শতের কী সম্পর্ক কাকু? বিসর্গের পরে তো এখানে চ-ও নেই ট-ও নেই ত-ও নেই।

কী নেই, সেটা কোনো কথা নয়। কী আছে সেইটে বল।

শ আছে।

এই। এই হল কথা। বিসর্গের পরে শ থাকে যদি তাহলে বিসর্গটাই বসে থাকে গ্যাঁট হয়ে, পালটায় না। তাই চতুঃ শত এক-সঙ্গে বললে হবে চতুঃশত। সরাসরি সংস্কৃত লিখনে অবিশ্যি চতুশ্‌শতও লেখা যায়। কিন্তু আমরা তো আর সংস্কৃত বলছি না। আমরা বলছি বাংলা। অন্তঃ আর শীলা মিললে কী হবে? অন্তঃশীলা। অন্তশীলা হবে কি? নিঃশব্দ, নিঃশেষ—এসব শুনিসনি?

আর ষ-স যদি থাকে পরে?

ওই একইরকম ব্যবস্থা। যেমন ধর প্রাতঃস্মরণীয়। স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে কি দুম করে একটা রেফ বসানো যায়? যায় না।

চ ছ ট ঠ ত থ বললে। ক খ আর প ফ বাদ দিলে কেন?

আহা বাদ কেন দেব? একটু একটু করে বলছি তো। বিসর্গের আগে যদি ই বা উ থাকে আর পরে থাকে ক খ প ফ, তাহলে বিসর্গ যায় পালিয়ে, উড়ে আসে একটা ষ। বহিষ্কার দুষ্কৃতি নিষ্ফল চতুষ্পাঠী, এইসব শব্দের দিকে তাকালেই টের পাবি। ওদিকে কিন্তু নমস্কার মনস্কাম পুরস্কার তিরস্কার। কেন বল তো?

আগে ই উ নেই বলে। সে তো হল কিন্তু তাহলে রেফটা হয় কোথায়? বিসর্গ থেকে র কি হয় না একেবারে?

খুব হয়। কয়েকটা ধ্বনি তো বাদ রেখেছি এখনো। স্বর-ধ্বনি যদি থাকে, য ল ব হ যদি থাকে, আর যদি থাকে প্রতিটি বর্গের শেষ তিনটে ধ্বনি তাহলেই চলে আসতে পারে র। অহরহ প্রাতরুত্থান বলতে পারি, বলতে পারি বহির্গমন নির্ঘোষ কিংবা অন্তর্জ্বলা নির্ঝর চতুর্দশ নির্ধন দুর্বল, আবির্ভাব।

ব্যাস! তাহলে আর হাজারটা গোলমাল কই? কয়েকটার ওপর দিয়েই তো চুকে গেল?

চুকল আর কই। শেষ যে ধ্বনিগুলোর কথা বললাম, তার বেলায় র-এর বদলে কখনো কখনো এসে যায় ও।

কে?

ও, মানে ও-কার।

সে আবার কখন?

আগে যদি অ না থাকে তাহলে ঝামেলা নেই, র-ই হবে। কিন্তু আগে যদি থাকে অ, তাহলে র হয় কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের বেলায়। বেশির ভাগ শব্দেই চলে আসবে ও। তখন পাবি সদ্যোজাত ছন্দোগুরু অকুতোভয়।

কাকু, একটা কথা বলি। এতসব মনে রাখার চেয়ে অকুতোভয়ে দুচারটে ভুল করে ফেলাই কি ভাল নয়?

নন্তুর এই নির্দয় কথা শুনে আমি এবার নিঃশব্দে বসে থাকি।

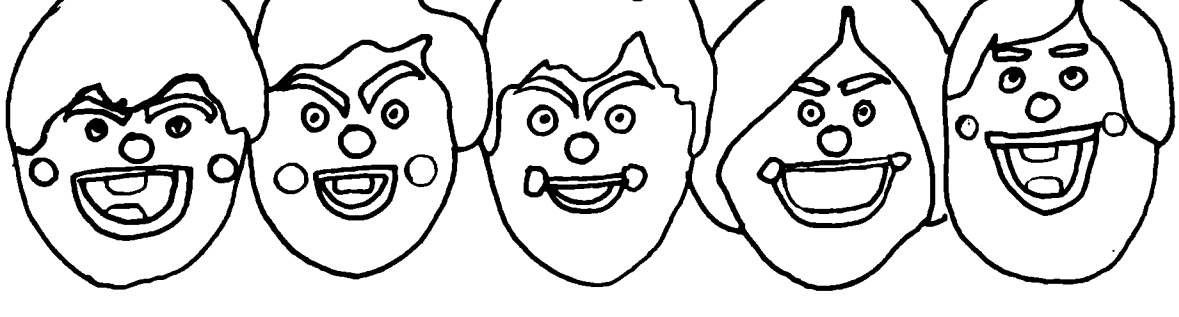

এই নদী কি সেই নদীটি?

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই যেখানে নদীর পাড়ে বটপাকুড়ের ছায়ে
এক ছিল গাঁ, গাঁয়ের শেষে মাঠের পায়ে পায়ে
একটু ছিল গাছগাছালি একটু সড়ক টানা—
কোথায় সে যায়? একজনারই ছিল সে পথ জানা।
সে ছিল সেই গাঁয়েরই এক উশ্‌কোচুলো ছেলে,
বাতাস ধেয়ে বেরিয়ে গেল ঘুড়ির পাঁজা ফেলে।
খানিকটা ছুট নাকবরাবর খানিকটা ছুট বেঁকা :
থমথমে পথ, কারো সাথে হল না তার দেখা।
তখনো রাত ঝামরে আছে, শুকতারা জ্বলজ্বল।
পেরিয়ে গেল মাঠের পারের কষাড় জঙ্গল।
পেরিয়ে গেল ঝুরিআঁধার সাতমহলা একা।
থমথমে বন, কারোর সাথে হল না তার দেখা।
চোখরাঙা দিন, তার পিছে ফের রৌদ্র ছলোছলো
কনুই চেপে ধরে তাকে বলল, "ঘরে চলো।"
সন্ধ্যাবেলার কিনার দিয়ে জঙলা নদীর সোঁতা
বলল, "দেখ এই ফুরোলো, আর যেতে চাও কোথা!"
তখনো ঘোর হয়নি ভালো, সাঁঝতারা জ্বলজ্বল,
পিদিম হাতে ঘুরছে পথে জোনাকি একদল—
সেই আলোতে ঠাহর করে পথ নেমেছে নীচে,
ঢেউগাঁথা জল চলছে যেথায় তেঁতুলরঙের বিছে।
তেঁতুলরঙের বিছে? না ও বেতল তালের বাঁশি!
ঐ কি সে পক্ষীরাজ কুমির—পাতালদেশের বাসী?
এক নিমিষে যায় চলে ওই বারোমাসের চলা—
ঘাটে ঘাটে ছড়িয়ে ছোটে চাঁদের ষোল কলা—
জলে জলে মিশিয়ে চলে ফিনিক-ভাঙা চাঁপা—
নহর মুছে গায় টেনে নেয় ঘুমতি কাঁথার চাপা!
সেই কি তুমি? আজ তা হলে রইল তোমার শোয়া।

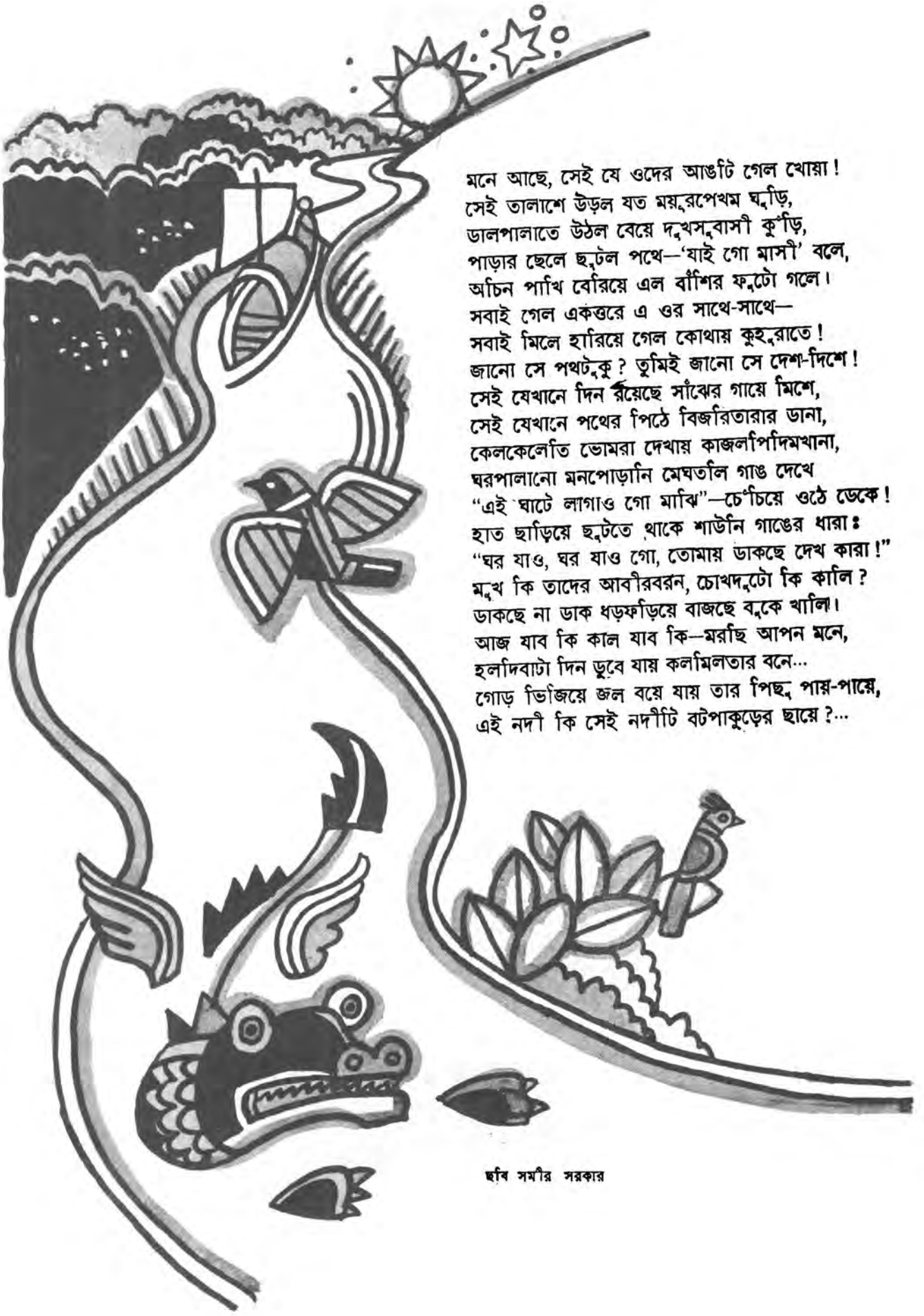

মনে আছে, সেই যে ওদের আঙটি গেল খোয়া!
সেই তালাশে উড়ল যত ময়ূরপেখম ঘুড়ি,
ডালপালাতে উঠল বেয়ে দুখসুবাসী কুঁড়ি,
পাড়ার ছেলে ছুটল পথে—'যাই গো মাসী' বলে,
অচিন পাখি বেরিয়ে এল বাঁশির ফুটো গলে।
সবাই গেল একত্তরে এ ওর সাথে-সাথে—
সবাই মিলে হারিয়ে গেল কোথায় কুহুরাতে!
জানো সে পথটুকু? তুমিই জানো সে দেশ-দিশে!
সেই যেখানে দিন রয়েছে সাঁঝের গায়ে মিশে,
সেই যেখানে পথের পিঠে বিজরিতারার ডানা,
কেলকেলেতি ভোমরা দেখায় কাজলপিদিমখানা,
ঘরপালানো মনপোড়ানি মেঘতলি গাঙ দেখে
"এই ঘাটে লাগাও গো মাঝি"—চেঁচিয়ে ওঠে ডেকে!
হাত ছাড়িয়ে ছুটতে থাকে শাউনি গাঙের ধারা:
"ঘর যাও, ঘর যাও গো, তোমায় ডাকছে দেখ কারা!"
মুখ কি তাদের আবীরবরন, চোখদুটো কি কালি?
ডাকছে না ডাক ধড়ফড়িয়ে বাজছে বুকে খালি।
আজ যাব কি কাল যাব কি—মরছি আপন মনে,
হলদিবাটা দিন ডুবে যায় কলমিলতার বনে...
গোড় ভিজিয়ে জল বয়ে যায় তার পিছু পায়-পায়ে,
এই নদী কি সেই নদীটি বটপাকুড়ের ছায়ে?...

ছবি সমীর সরকার

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

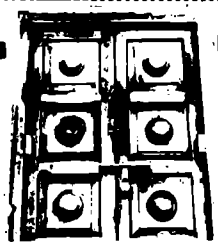

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

গোগোল বিকেলে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে, ওদের বিল্ডিংয়ের সেভেনথ ফ্লোরের ডাবুদার হারিয়ে যাবার খবর শোনার পর থেকেই ভীষণ চিন্তিত আর ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ডাবুদা গতকাল সেই যে ইস্কুলে বেরিয়েছিল, আজ সন্ধ্যা উতরে যাওয়ার পরেও ফেরেনি। এই বিল্ডিংয়েরই হনুমন্তিয়াজীর আশঙ্কা, ডাবুদাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন লোক বা দল কোথাও নিয়ে গিয়ে আটকিয়ে রেখেছে, এবার ডাবুদার বাবা নীহারবাবুর কাছে মুক্তিপণ হিসাবে অনেক টাকা চাইবে। না পেলে ডাবুদাকে হয় তো মেরে ফেলবে। গোগোল ওর বন্ধু জর্জ, টুকাই, পারভেজ, সুমিত, গোগেদের সঙ্গে নীচের লনে বসে অনেক আলোচনা করেছে, ডাবুদার কী হতে পারে? এই আলোচনার মধ্যেই গোগোল কয়েকবার সিঁড়ি দিয়ে আর লিফটে ওঠা নামার সময়ে দুটো আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ করেছে। একটা হচ্ছে সিকসথ ফ্লোরে মহেশানিদের বন্ধ দরজা ফ্ল্যাটের মধ্যে সন্দেহজনক নানান শব্দ। অথচ মহেশানিরা সপরিবারে দিল্লি চলে গিয়েছেন। যদিও ওঁদের ভৃত্য চান্দা সিং ফ্ল্যাট পাহারা দেবার জন্য রয়েছে, তবু শব্দগুলো কেমন যেন ভুতুড়ে। আর একটা অচেনা লোককেও গোগোল কয়েকবার ওঠা-নামা করতে দেখেছে, যাকে দেখে ওর ড্রাইভারের মতো মনে হয়েছে। লোকটার গোঁফ আছে, সাদা-কালো ডোরাকাটা শার্ট আর কালো ট্রাউজার পরা। গোগোল জর্জকে নিয়ে যখন মহেশানিদের বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে বেল টিপল, সেটা বাজল না। কিন্তু ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়ে একবার দেখল ভিতরে সামান্য আবছা আলো জ্বলছে, তারপরেই যেন কেউ ছিদ্রটা ঢেকে দিল। জর্জকে একথা বলার আগেই ড্রাইভারের মতো সেই লোকটা মহেশানিদের দরজার সামনে এসে পড়ল। গোগোল আর জর্জ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল, আর শুনতে পেল, লোকটা দরজা ধাক্কা দিয়ে চান্দা সিংকে চিৎকার করে ডাকছে। ব্যাপার কী? গোগোল আর জর্জ উঠে এসে, লোকটার কাছেই জানতে পারল, সে হল চান্দা সিংয়ের মামা। চান্দা সিং তাকে আসতে বলে নিজেই হাওয়া। সে চলে গেল। জর্জ ঠাট্টা করে গোগোলকে বলল, ডাবুদা হারিয়ে যাওয়ায়, ও নাকি সবই ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখছে। এদিকে গোগোলদের বাড়িতে কাজ করে, বিশ-বাইশ বছরের বঙ্কিমদা, গোগোলকে ডেকে বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর—

॥ ৭ ॥

বঙ্কিমদার সঙ্গে ঘরে ঢোকবার আগেই গোগোল দেখল, মা খোলা দরজার সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলেন, "কোথায় গেছিলি তুই? বঙ্কিম আমাদের এসে দুবার বলে গেল, নীচে কোথাও দেখতে পায়নি!"

গোগোল জানে, মা আসলে ভয় পেয়েছিলেন। ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায়, এই বিল্ডিং আর পাড়ার সব মায়েরাই ভয় পেয়েছেন। মায়ের রাগ আসলে ভয়, গোগোল সেটা জানে, কিন্তু মাকে সে-কথা বলা যায় না। ওর হয়ে বঙ্কিমদাই জবাব দিল। "গোগোল বাড়ির বাইরে ছিল না। দোতলায় সেই সাহেববাড়ির ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছিল।"

সাহেববাড়ির ছেলে মানে জর্জ। জর্জদের গোটা বাড়িতেই, কয়েকটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার বাস করে। সেইজন্য বঙ্কিমদার মতো লোকেরা ওটাকে সাহেববাড়ি বলে।

গোগোলকে দরজা ছেড়ে দিয়ে, মা বিরক্ত স্বরে বললেন, "দোতলাতেই থাকুক, আর যেখানেই থাকুক, মাস্টারমশাইয়ের পড়াতে আসার সময় হয়ে গেছে, সে-কথা মনে থাকে না কেন?"

মাস্টারমশাই মানে সমীরদার পড়াতে আসার কথা ভুলে যাওয়াটা অন্যায়। কিন্তু কেন যে মনে ছিল না, মাকে সেটা বোঝানো মুশকিল। গোগোল যদি এখন মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরের আওয়াজ, সেই ড্রাইভার লোকটার কথা মাকে বলতে যায়, তা হলে মা আরো রেগে যাবেন। ও বাড়ির ভিতরে ঢুকে, বাঁ দিকে বসবার ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখল, বাবা একটা মোটা বই নিয়ে পড়ছেন। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে, বাবা সাধারণত পড়াশোনা করেন। কোন কোনদিন বেরিয়েও যান। অথবা বাবার বন্ধুরাই কেউ-কেউ বাড়িতে আসেন।

গোগোল ঘরের ভিতরে, বাথরুমে গিয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে বেরিয়ে এল। একটা ঘর বাবার, আর একটা ঘর মায়ের। গোগোলের বাবার পড়াশোনা করার টেবিল আছে। গোগোল সেখানেই পড়ে। মা এখন বঙ্কিমদাকে নিয়ে রান্নাঘরে যাবেন রান্নার তদারকি করতে। তারপরে বাবার সঙ্গে গল্প করবেন, বা বাবার বন্ধুরা এলে তাঁদের সঙ্গেও গল্প করবেন। আবার বাবা-মা দুজনে কোথাও বেরিয়েও যেতে পারেন।

গোগোল বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে বসতেই মা এলেন, বললেন, "শোনো গোগোল, তোমার বাবার কাছে শুনলাম, তুমি ডাবুদের ফ্ল্যাটে গেছলে। আমি খুব বিরক্ত হয়েছি। বড়দের ব্যাপারে তুমি একদম নাক গলাবে না বলে দিলুম।"

গোগোল জানত, বাবা নিশ্চয় মাকে কথাটা বলে দেবেন। ও বলল, "আমি বড়দের ব্যাপারে যাইনি মা, পুলিস অফিসাররা কী বলেন, তাই শুনতে গেছলাম।"

মা বললেন, "ওকেই বলে বড়দের ব্যাপারে নাক গলানো। পুলিস অফিসারদের কথা শোনবার দরকার কী তোমার? যা ঘটবে, তা তো তুমি বাড়িতে বসেই শুনতে পাবে।"

মায়ের কথার মধ্যেই গোগোলের মনে পড়ে গেল হনুমন্তিয়াজীর কথা, আর ও তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "মা, শোনো শোনো, ফিফথ ফ্লোরের হনুমন্তিয়াজী কী বলেছেন জানো? ডাবুদাকে নাকি কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথাও নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, এবার ডাবুদার বাবার কাছে অনেক টাকা চেয়ে পাঠাবে।"

মা রাগ করবেন না হেসে ফেলবেন কিছু যেন বুঝতেই পারলেন না। বললেন, "তোর মাথায় দেখছি ডাবুদা ছাড়া কিছুই নেই। আমি তোর বাবার মুখে সবই শুনেছি। কিন্তু তোকে যে আমি ওসব নিয়ে ভাবতে বারণ করছি, তা তোর খেয়ালই নেই।"

গোগোল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি আর ওসব কথা একদম ভাবব না। কিন্তু মা, ডাবুদাকে যারা চুরি করে নিয়ে গেছে, তারা টাকা না পেলে কি সত্যি ডাবুদাকে মেরে ফেলতে পারে?"

মা এবার সত্যি হেসে ফেললেন, বললেন, "তোকে নিয়ে আমি সত্যি আর পারি না। এইমাত্র না বললি, ওসব নিয়ে তুই আর একদম ভাববি না? আমি কি মন্ত্র জানি যে গুনে বলে দেব, লোকগুলো ডাবুকে মেরে ফেলবে কি না? এটা তো হনুমন্তিয়াজীর একটা আন্দাজ মাত্র। আসলে কী ঘটেছে, কেউ বলতে পারে না।" বলতে-বলতে মা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি আর তোমার মুখ থেকে এসব কথা একটুও শুনতে চাই না। পড়ায় মন দাও।"

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই কলিং বেল বেজে ওঠার শব্দ হল। আর সমীরদা এসে ঘরে ঢুকলেন। সমীরদা তিতুদারই বয়সী, কিন্তু তিতুদার মতো গোঁফ নেই। সমীরদা এখন ল'

আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়েন। ও'র স্বাস্থ্য খুব ভাল, খেলাধুলোয় বেশ নাম আছে। ফ্রি স্টাইল সাঁতারে একবার ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আজকাল সাঁতারের থেকে ভলি বলের দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন। সমীরদা এমনি বেশ হাসিখুশি। অনেক মজার মজার গল্প বলতে পারেন। কিন্তু টাস্‌ক্‌ করে না রাখলে বা পড়া করে না রাখলে, ও'র মুখটা এমন থমথমিয়ে ওঠে, তাকাতেই ভয় লাগে। সমীরদা রেগে গেলে, একটি কথাই খালি বলেন, "গোগোল, আমি ভাবছি, কাল থেকে আর তোমাকে পড়াতে আসব না। অমনোযোগী ছেলেদের, আমার একটুও পড়াতে ইচ্ছে করে না।"

সমীরদার এই কথাটা শুনলে, গোগোলের প্রায় কান্না পেয়ে যায়। সমীরদা চলে না-গিয়ে বরং গোগোলকে যদি দু ঘা মারেন, তাও সহ্য করা যায়। কিন্তু সমীরদা আর পড়াতে আসবেন না, গোগোল ভাবতেই পারে না। ও তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "আমি আর কখনো অমনোযোগী হব না, সমীরদা।"

তবে এরকম কদাচিৎ ঘটে। সমীরদা আসতেই মা বললেন, "আসুন। আপনার ছাত্রের মাথায় আজ পোকা ঢুকেছে, পড়াশোনা বোধহয় হবে না।"

সমীরদা গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন, কী আবার ঘটল?"

মা ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে, ঘর ছেড়ে যাবার আগে সমীরদাকে বললেন, "আপনার ছাত্রকে একটু সাবধান করে দেবেন, বাড়ি থেকে যেন যখন-তখন যেখানে খুশি না বেরিয়ে যায়।"

সমীরদা তাঁর চেয়ারে বসে বললেন, "মায়ের কথাটা মনে রেখো। নইলে ডাবুর মতো তুমিও হারিয়ে যেতে পারো, বুঝলে তো?"

গোগোল চেয়ারে বসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানাল, বুঝেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু সমীরদা, ডাবুদার মতো একজন বড় ছেলে কি হারাতে পারে?"

সমীরদা বললেন, "ছোট ছেলেদের মতো তোমাদের ডাবুদা হারিয়ে যেতে পারে না। হয়তো কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে।"

গোগোল বলল, "আমার বন্ধু জর্জও ঠিক এ-কথা বলছিল।"

সমীরদা বললেন, "আচ্ছা, এসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে, এখন লেখাপড়া শুরু করা যাক। সকালবেলা যে-টাস্‌ক-গুলো করেছ, সেগুলো বের কর। তার আগে, আজকের ইস্কুলের পড়া কী করেছ, তা দেখাও।"

গোগোল বুঝল, এখন আর অন্য কোন কথা চলবে না। পড়ায় মনোযোগ দিতে হবে। ও সে-চেষ্টাই করল। আর খুবই ভাগ্য ভাল, পুরনো টাস্‌ক আর নতুন পড়া ভালভাবেই দেখিয়ে আর করে নিতে পারল। কিন্তু পড়া করতে-করতেই আটটা বেজে গেল। সমীরদা সপ্তাহে পাঁচ দিন, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে রাত্রি আটটা অবধি পড়ান। তার মধ্যেই মায়ের পাঠানো চা আর সামান্য জলখাবার খেয়ে নেন। কিন্তু পড়াবার সময় সমীরদা কখনো সিগারেট খান না। অথচ গোগোল জানে, সমীরদা সিগারেট খান।

সমীরদা গোগোলকে একেবারে হতাশ করলেন না। বইখাতা গোছানো হয়ে যাবার পরে জিজ্ঞেস করলেন, "ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়?"

গোগোল উৎসাহিত হয়ে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কেবলই ভয় করছে।"

সমীরদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ভয় করছে কেন?"

গোগোল বলল, "কিছুদিন আগে সেই একটি গুজরাটী ছেলের খবর বেরিয়েছিল, যাকে কারা মেরে ফেলেছিল, আমার খালি সেই ঘটনার কথা মনে পড়ছে।"

সমীরদা বললেন, "তা নাও হতে পারে। গুজরাটী ছেলেটির হারানোর সব ব্যাপারটাই ছিল সাজানো। খবরের কাগজে সংবাদটা আমি পড়েছিলাম। গুজরাটী ছেলেটির ঘটনায় তার চেনাশোনা আত্মীয়স্বজনরা জড়িয়েছিল। ডাবুর ব্যাপারে সেরকম না হতেও পারে।"

গোগোল বলল, "ডাবুদার বাবাও খুব বড়লোক।"

সমীরদা হেসে বললেন, "বড়লোক হলেই যে ডাবুদার চেনা-শোনা আত্মীয়স্বজনরা ওরকম কিছু করবেন, তা ভাববার কোন কারণ নেই। তোমার মায়ের কাছে ডাবুর কথা যা শুনলাম, তাতে এমনও হতে পারে, সে হয়তো আজেবাজে লোকের সঙ্গে বম্বে-টম্বে কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে।"

গোগোল ভীষণ অবাক হয়ে বলল, "বম্বে-টম্বে কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে পড়তে পারে?"

সমীরদা হেসে বললেন, "কেন, এত অবাক হবার কী আছে? এই তো কয়েকদিন আগেই একটা খবর বেরিয়েছিল, তোমাদের ডাবুদার বয়সী একটি ছেলে বাড়িতে কারোকে কিছু না বলে, দূরপাল্লার এক ট্রাকে চেপে বেড়াতে চলে গেছল। কেন? না, সেই ট্রাকের ড্রাইভার ছিল নাকি ছেলেটির খুব চেনাশোনা, আর দুজনের মধ্যে ছিল খুব খাতির। তুমি বুঝি খবরটা পড়নি?"

খবরটা গোগোল পড়েনি, কিন্তু মনে পড়ে গেল ওদের পাড়ারই পাকড়াশীদের বাড়ির একটি ছেলে, কয়েক মাস আগে, বাড়িতে কিছু না জানিয়ে তার আরো দুটি বন্ধুর সঙ্গে বম্বে পালিয়ে গিয়েছিল। কলকাতার পুলিসই তাদের সন্ধান করে

বম্বে থেকে কলকাতায় আনিয়েছিল। সব থেকে খারাপ কথা হল, পাকড়াশীদের বাড়ির ডাবুদার বয়সী ছেলেটি, আর তার আরো দুজন বন্ধু, তিনজনেই বাড়ি থেকে অনেকগুলো টাকা নিয়েছিল, আর তারা স্বীকার করেছিল, বম্বের হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার জন্যই নাকি তারা ওভাবে পালিয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে সবাই হাসাহাসি করেছিল, আর তিনজনকেই বেশ কিছুদিন খুব শাসনে রাখা হয়েছিল। গোগোল পাকড়াশীদের বাড়ির ছেলে মিতুনকে (আসলে মৃত্যুঞ্জয়) চেনে। মিতুন ক্লাস টেনে পড়ে। এখন নাকি সে খুব ভাল ছেলে হয়ে গিয়েছে।

গোগোলের ঘটনাটা মনে হতেই সমীরদাকে বলল। সমীরদা হেসে বললেন, "তোমাদের ডাবুদার কথা যা শুনলাম, হয়তো দেখা যাবে, সেও ওরকমই পালিয়েছে, আবার সময় হলেই ফিরে আসবে, নয়তো পুলিস খুঁজে বের করবে।" বলতে বলতে সমীরদা চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বললেন, "ওসব ভেবে মাথা খারাপ করো না। তবে হ্যাঁ, একটু সাবধানে থাকা উচিত। কখন কী থেকে কী ঘটে যায়, কিছুই বলা যায় না।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আপনি ছেলেধরাদের কথা বলছেন?"

সমীরদা বললেন, "তোমাদের বয়সী ছেলেদের ছেলেধরারা চুরি করতে পারবে না। তারা আরো কম বয়সের ছেলেমেয়েদের চুরি করে। তারা হল খুবই নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধী। কিন্তু তা ছাড়াও, নানারকম মতলববাজ লোক আছে, তাদের জন্যই সাবধান থাকা দরকার। তবে মনে রেখো, আমাদের চারপাশে অধিকাংশ লোকই ভাল। শুধু-শুধু খারাপ ভেবে মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত না।" এই বলে সমীরদা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

গোগোল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। ভাবল, ডাবুদা কি সত্যি বম্বে পালিয়ে যেতে পারে? কিন্তু টাকা পাবে কোথায়? সবাই জানে, ডাবুদা বাড়ি থেকে টাকা পয়সা কিছু নেয়নি। রোজ যেমন খেয়েদেয়ে বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে যায়, সেইরকমই বেরিয়েছিল, আর ফেরেনি। সমীরদা অবিশ্যি ডাবুদার মতো ছেলের সম্পর্কে ঠিকই ভেবেছেন। ডাবুদা এখন থেকেই জ্যাকি পিলুর মতো বয়সে বড় বাজে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, ব্যান্ডমাস্টারের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে তাদের সঙ্গে সিগারেট খায়। গোগোল নিজের চোখেই ডাবুদাকে কয়েকবার সিগারেট খেতে দেখেছে।

সিগারেট তো গোগোলের বাবাও খান। বড়রা অনেকেই খান। বাবা যেমন গোগোলকে বলেছেন, "সব কিছুরই একটা সময় আছে। ছেলেরা বড় হলেই বুঝতে পারে, তারা কে কী করবে না করবে।" কিন্তু ডাবুদা জ্যাকি পিলুদের সঙ্গে রেগুলার সিনেমা দেখতে যায়, রেস্টুরেন্টে খায়। ডাবুদা যা ছেলে, বলা যায় না, সেও হয়তো কোনো ট্রাক-ড্রাইভারের সঙ্গে দূরপাল্লায় বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে। এই ধরনের লোকদের সঙ্গেও ডাবুদাকে মেলা-মেশা করতে দেখা যায়।

গোগোলের আবার মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরের শব্দ আর, আলো আর হঠাৎ অন্ধকারের ছবি মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য, এ-বিষয়টা তো সমীরদাকে বলা হল না, অবিশ্যি বললে হয়তো সমীরদাও জর্জের মতোই ঠাট্টা করে হাসতেন, আর বলতেন, "ডাবুদার হারিয়ে যাবার কথা ভেবে ভেবে, তোমার সব গোলমাল হয়ে গেছে।"

এই সময়ে বঙ্কিমদা এসে ঘরে ঢুকল, বলল, "হাত ধুয়ে খাবার খেতে এসো।"

গোগোল তাড়াতাড়ি ডেকে বলল "বঙ্কিমদা, একটা কথা শোনো। মহেশানিদের চান্দা সিংকে তুমি দেখতে পেয়েছ?"

বঙ্কিমদা অবাক হয়ে বলল, "চান্দা সিংকে? কখন?"

গোগোল বলল, "আজ কোন সময় দেখেছ?"

বঙ্কিমদা বলল, "হ্যাঁ, আজ সকালেই তো তাকে দেখেছি। আর দেখেছি কি না মনে করতে পারছি না। কেন বলো তো?"

গোগোল বলল, "চান্দা সিংয়ের এক মামা এসে তাকে খুব ডাকাডাকি করছিল, কিন্তু সে ফ্ল্যাটে ছিল না। এমন কী, কলিং-বেলের সুইচটাও অফ করে দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে। অথচ সে তার মামাকে নাকি নিজেই আসতে বলেছিল।"

বঙ্কিমদা বলল "চান্দা সিংয়ের সঙ্গে আমি মিশি না, তার কথাও জানি না। তুমি তাড়াতাড়ি খেতে এসো, নইলে মা এখুনি বকুনি লাগাবেন।" বলে বেরিয়ে চলে গেল।

গোগোল জানে, খাবারের টেবিলে যেতে দেরি হলে, মা এখুনি ডাকাডাকি করবেন। কারণ গোগোলের খাবার সময় মা জানেন, আর সেই সময়ে মা নিজে টেবিলে হাজির থাকবেন। খাবার পরে, মায়ের শোবার ঘরে গোগোল শুতে যাবে, আর সেই সময়েই ওর গল্পের বই পড়ার সময়।

গোগোল খাবার ঘরের বেসিনে হাত ধুতে গিয়েই টের পেল, বাবার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছেন। মাও এখন সেখানে। সকলেরই গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। কথাবার্তার মধ্যে ডাবুদার নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ওঁরা কী নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু গোগোলের ওখানে যাবার উপায় নেই। বঙ্কিমদাও টেবিলে ওর খাবার দিয়ে দিয়েছে।

গোগোল খাবার খেয়ে, মাকে বলে, শোবার ঘরে চলে গেল। যাবার আগে, পড়ার ঘর থেকে গল্পের বই নিয়ে গেল। সায়েন্স ফিকশন বলতে যা বোঝায়, এই বইটা তাই। নাম "দূর আকাশের সাত ঘোড়ার রথ"। আসলে সেই রথ পৃথিবীর কোনো লোক চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, না অন্য কোন গ্রহের প্রাণী, একজন বিজ্ঞানী তারই অনুসন্ধান করে চলেছে। গল্পটা খুবই জমে উঠেছে। কিন্তু গোগোলের মাথায় অন্য চিন্তা। সমীরদার কথা শুনে, ডাবুদার সম্পর্কে ওর মনে আর তেমন কৌতূহল নেই। ডাবুদা যা ছেলে, সমীরদার ধারণামতোই হয়তো কিছু একটা করেছে।

কিন্তু মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরের ব্যাপারটা কী? গোগোল বই কোলে নিয়ে বসে, বন্ধ দরজার সব ব্যাপারগুলো আবার আগাগোড়া ভাবল। চুপিচুপি। "এই চুপ!" আওয়াজ, ধুপ্ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ, ছিদ্রে সব সময়েই ভারি পর্দার অন্ধকার। তারপরে হঠাৎ একবার অল্প পাওয়ারের আলোর দেখা পাওয়া, আর হঠাৎই আলো ঢাকা পড়ে যাওয়া, এ সব মিথ্যে? জর্জ যতই ঠাট্টা করুক আর হাসুক, গোগোল কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। আর সেই লোকটা, যাকে ও ড্রাইভারের মতো দেখতে ভেবেছিল, লোকটা সত্যি তাই!

গোগোলের মনে আরো প্রশ্ন জাগল। ওর ভাবনার সঙ্গে না হয় একটা বিষয় মিলে গিয়েছে, লোকটা সত্যি ড্রাইভার। কিন্তু এত সময় ধরে, গোটা বাড়িটার ওপর-নীচে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল কেন? সে তো যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই, মহেশানিদের ফ্ল্যাটের খবর পেয়ে যেত। তা না করে কেন দু ঘণ্টা ধরে কেবল মহেশানিদের ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াচ্ছিল? গোগোল কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। লোকটা তো গোগোলকেই জিজ্ঞেস করতে পারত? কেন করেনি? আর আটতলা থেকে লিফটে নামার সময়, লোকটার বাঘের মতো চোখ দেখে ওর গা ছমছমিয়ে উঠেছিল কেন?

গোগোলের আরো মনে পড়ল, ও যখন দ্বিতীয়বার মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরে হিসিয়ে ওঠার শব্দ শুনে, লকের ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে দেখছিল, তখনই কেউ যেন ওপর থেকে নেমে আসতে গিয়ে, হঠাৎ দৌড়ে আটতলায় উঠে গিয়েছিল। গোগোলও

ছুটে গিয়েছিল আটতলায়, আর সেই লোকটাকেই দেখেছিল লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা তখন একবারও গোগোলের দিকে তাকায়নি। অথচ লিফটের খাঁচায় ঢোকবার পরে লোকটা বাঘের মতো তাকিয়েছিল। লোকটা কখনোই ভাল হতে পারে না। জর্জ যাই বলুক, গোগোল কখনো মেনে নিতে পারবে না, লোকটা নেহাত ভাল মানুষ। অথচ লোকটা দেখতে ভালই। তা ছাড়া, শেষবার লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়ে, গোগোল আলো দেখেছিল কেমন করে? পর্দাটা ফেলেই বা দিল কে? অথচ চান্দা সিং কলিংবেলের সুইচটা পর্যন্ত অফ করে বেরিয়ে গিয়েছে। কেন? এরকম আবার কেউ করে নাকি?

মা ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বললেন, "এ কী, গোগোল, রাত্রি দশটা বাজতে চলেছে, তুমি এখনো গল্পের বই নিয়ে বসে?"

রাত্রি দশটা বাজতে চলেছে? গোগোল তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতা বন্ধ করে দিয়ে, বইটা নিজের বিছানায় বালিশের পাশে রেখে শুয়ে পড়ল। মনে-মনে ভাবল, মা বুঝতে পারেননি, গোগোল আসলে অন্য কথা ভাবছিল। সেটা বুঝতে পারলে, মা নিশ্চয়ই রাগ করতেন। গোগোল শুয়ে পড়তেই মা বললেন, "চোখ বোজো, আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে খেতে যাচ্ছি।"

গোগোল চোখ বুজল। মা আলো নিভিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গোগোলের বন্ধ চোখের সামনে অন্ধকারে মহেশানিদের বন্ধ দরজাটাই ভেসে উঠল, আর তার সঙ্গে সেই লোকটার মুখ।.....

গোগোল ভোর সাড়ে ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে দেখল, মা ওর আগেই উঠে গিয়েছেন। বাথরুমের দরজাটা খোলা দেখেই বুঝতে পারল, মা আর বাবা সকালের চা নিয়ে খাবার টেবিলে বসে গিয়েছেন। খবরের কাগজও বোধহয় এর মধ্যেই এসে গিয়েছে। গোগোল আগে বাথরুমে গেল। বেসিনের জল খুলে চোখেমুখে জল দিয়ে, নিজের টুথ ব্রাশে পেস্ট নিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। খবরের কাগজে ডাবুদার কোন খবর বেরিয়েছে কি না, জানবার জন্য খাবার ঘরে গেল। দেখল, বাবা মা দুজনেই খবরের কাগজ পড়ছেন।

গোগোল কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কলিংবেল বেজে উঠল। বঙ্কিমদা দরজা খুলে দিল। হনুমন্তিয়াজী একেবারে হনহন করে খাবারের টেবিলের সামনে এগিয়ে এসে বাবাকে বললেন, "আমি যা বলেছিলাম তাই হয়েছে। ডাকাতরা ডাবুকে লুকিয়ে রেখেছে, এখন টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।"

গোগোল পরিষ্কার টের পেল, ওর গলা দিয়ে খানিকটা পেস্ট ঢুকে গেল। বাবা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাই নাকি? বসুন বসুন, হনুমন্তিয়াবাবু। কী করে জানা গেল?"

হনুমন্তিয়াজী একটা চেয়ারে বসে বললেন, "কী করে আবার। কাল রাত দুটোর সময় ডাকাতরা টেলিফোন করে নীহারবাবুকে বলেছে, ডাবুকে তারা লুকিয়ে রেখেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে ছেড়ে দেবে।"

(ক্রমশ)

ছবি সমীর সরকার

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

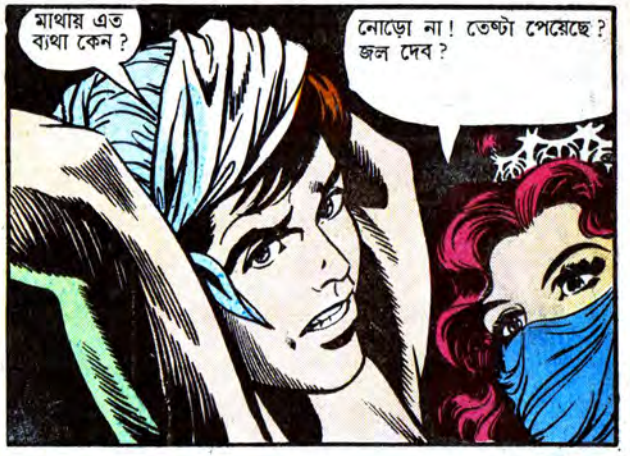

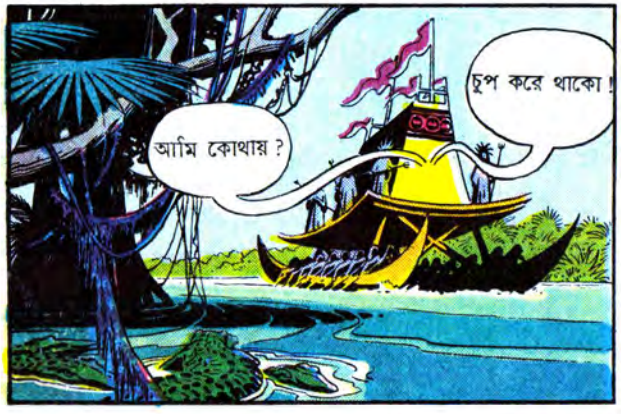

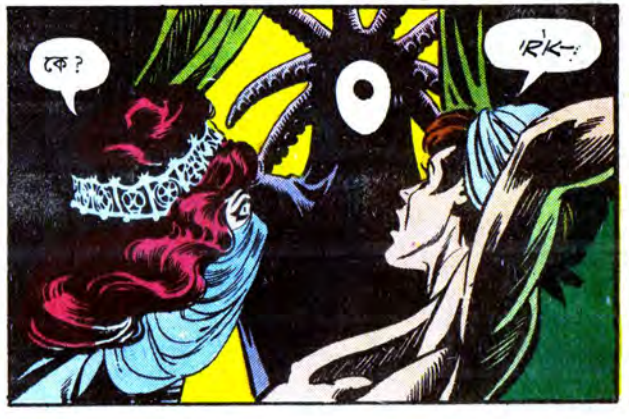

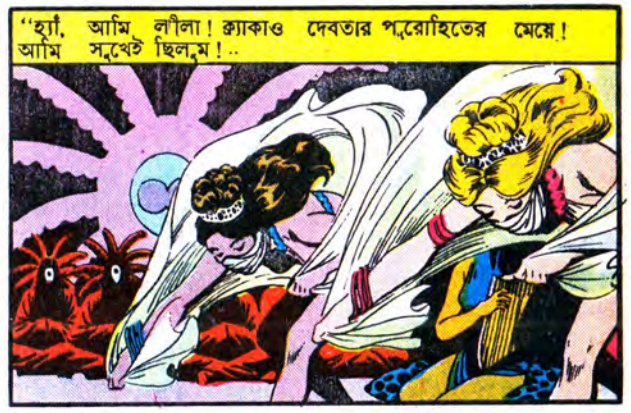

(এর পর ছাব্বিশের পাতায়)

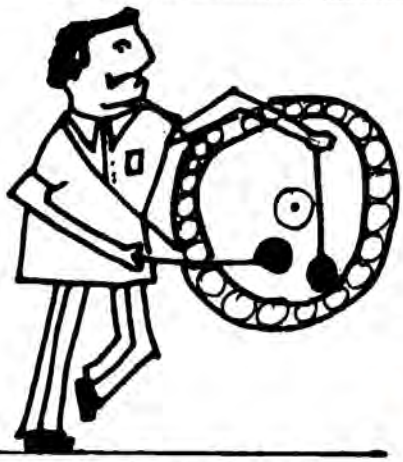

ছবি এঁকেছে সমীক ঘোষ (বয়স—৬)

বৃষ্টি

অফিসের বাসে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। যেই না বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছলাম অমনি ঝড় উঠল, আর বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি! ছাতা দিয়েও বৃষ্টি আটকাতে পারলাম না।

মেসো বলল, "ওদিকের শেডের তলায় চলো, তাহলে বৃষ্টি লাগবে না।" দৌড়ে সেখানে গেলাম, তবুও একটু-একটু বৃষ্টি আসছিল। যত ঝড়-বৃষ্টি বাড়ছিল তত আমাদের ছাতা নিয়ে লুকোচুরি খেলা বাড়ছিল। ঝড় একটু কমল। একটা বাস এল। মেসোরা যখন বাসে চেপে চলে গেলেন, তখন জলে ভিজে গেছে আমার সারা শরীর, আর দু চোখ।

কল্লোল মল্লিক (বয়স-৬)

কলির কথা

আমার নাম কলি
শুধুই কথা বলি
আমার ভাই শিখা
নাচি ধিনতা, ধিনতা

কাকলি দত্ত (বয়স—১০)

ছবি এঁকেছে বিবেকানন্দ মাইতি (বয়স—১২)

শিল্পী পাখি

বাবুই পাখি শিল্পী পাখি
গরব ভারী তার
তার মতো বাসা তৈরি
করে না কেউ আর।
নিজের হাতের তৈরি বাসা
দেখতে বড়ো ভাল
রাত্রিবেলায় জোনাক দিয়ে
জ্বালায় বাসায় আলো।

সুব্রত কুণ্ডু (বয়স-৮)

মুন্নি

মুন্নি রে মুন্নি
এত বড় ডিস্‌টাকে করলিরে চূর্ণ
বইটই তছনছ
পাতাগুলো খেয়ে ফেলে
হলি কিরে দিগ্‌গজ?
পুতুলের ট্যারা চোখ
দিই করে ঠিকঠাক
চেটে ফেলে ফেবারিক
করে দিলি সব ফাঁক?
শাড়ি কেটে আমি তারে
দিই ফ্রক পরিয়ে
দুই দিনে সাফসুফ
দিল কোথা সরিয়ে?
শাড়ি পরে টিপ পরে
যেন পাকা গিন্নি
দুষ্টুমি এত তুই
করিস না মুন্নি।

সোমা দত্ত (বয়স—১৫)

এক যে ছিল ব্যাঙ

এক যে ছিল ব্যাঙ
নাম ছিল তার চ্যাঙ।
খোঁড়া একটা ব্যাঙ
মারল তাকে ল্যাং।
উলটে গেল চ্যাঙ
ভাঙল যে তার ঠ্যাঙ
কাঁদে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ।

অভীক বর্ধন (বয়স—১০)

রান্না

একদিন ইস্কুলে,
জনা ছয়-সাত মিলে
করলাম রান্না।
দিদিমণি খেয়ে ভোলে,
দাদামণি হেসে বলে,
পায় মোর কান্না।

দীপঙ্কর চৌধুরী (বয়স ৯)

শুনুন

আমার নাম তাতুন
সবাই শুনুন
দাদার নাম খুকুন
সবাই রুখুন

কিরণশঙ্কর দে (বয়স—৮)

ইঁদুর

এক যে ছিল ইঁদুর
সে মাখত গায়ে সিঁদুর।
যেই না এল বর
খেল দুধের সর।

চন্দন চৌধুরী (বয়স—৬)

উঠে দেখি

খট খট নড়ে কড়া
চটপট উঠে পড়ো
ঘরে বুঝি চোর এলো
যাও তারে চেপে ধরো।
উঠে দেখি চোর নয়
আমাদের হুলোটা
লেজ নাড়ে দরজায়
তাই নড়ে কড়াটা।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স—১০)

বকুল

তার নাম বকুল
মাথা ভরা চুল
খায় শুধু কুল
ভালবাসে ফুল।

গার্গী দত্ত (বয়স—৭)।

ঘোড়া

এক যে ছিল ঘোড়া
বসত পেতে মোড়া
খেত কচি ঘাস
ঘুমোতো চার মাস।

শুভাশিস ঘোষ (বয়স—১১)

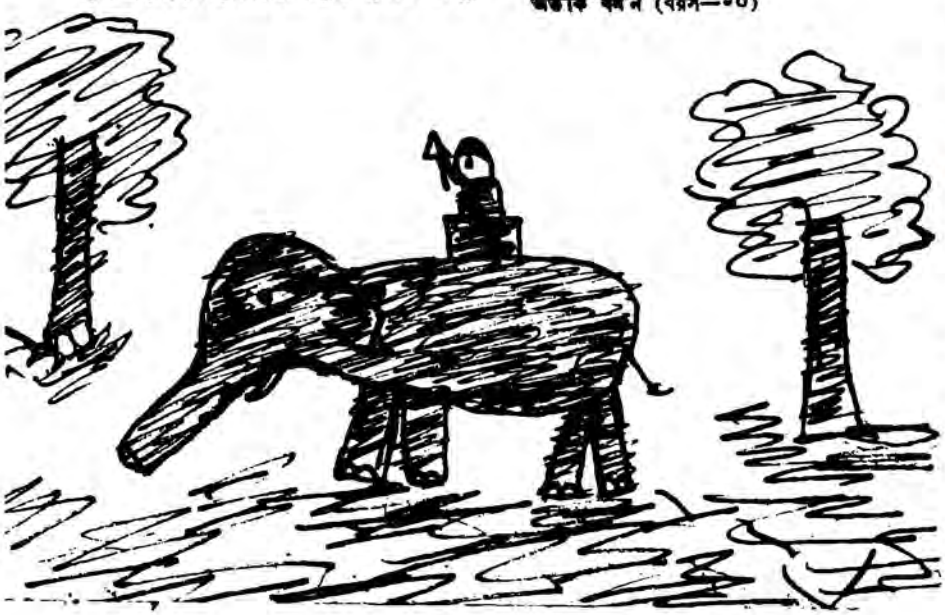

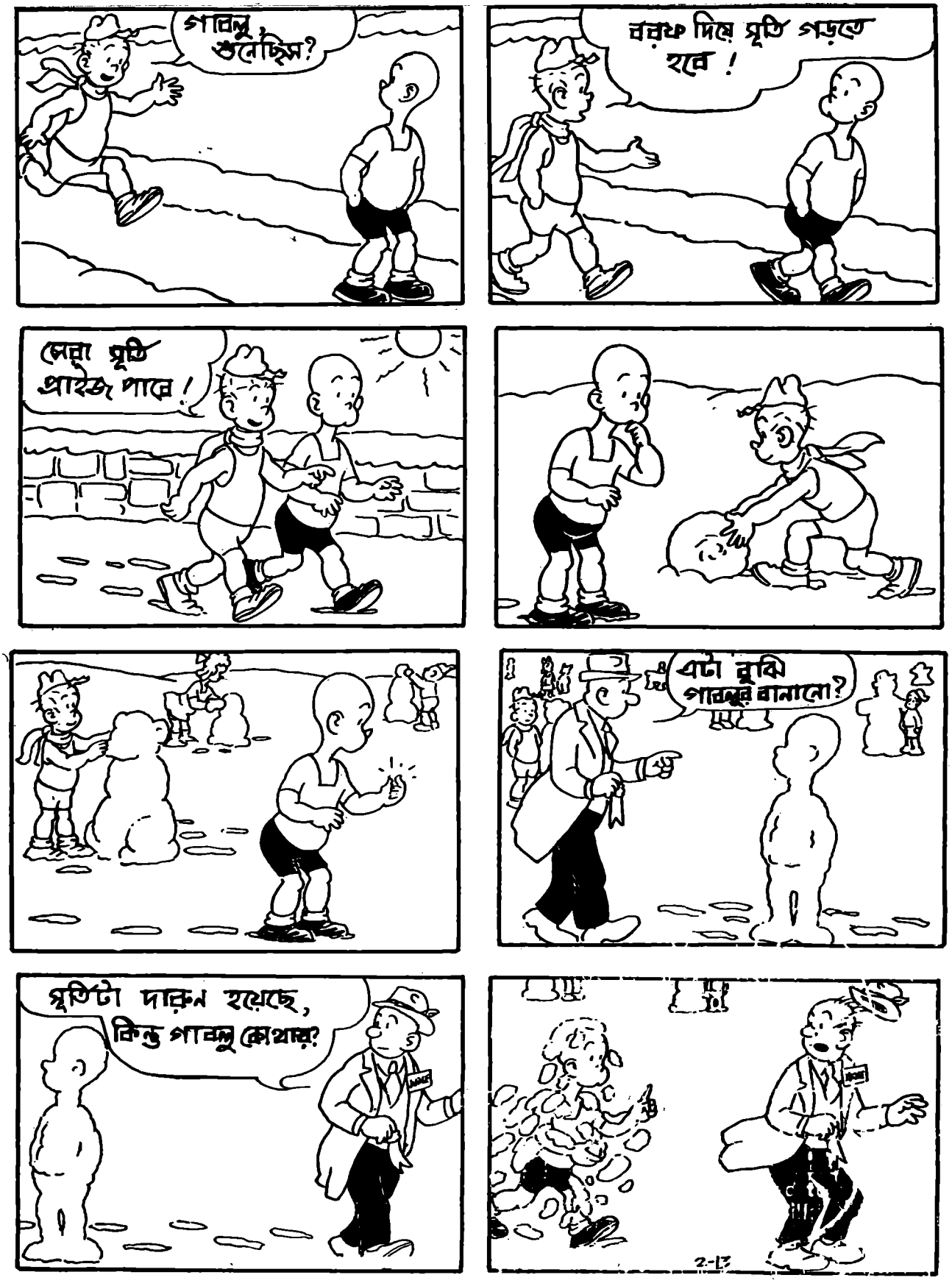
গাবলু, শুনেছিস?
বরফ দিয়ে মূর্তি গড়তে হবে!
সেরা মূর্তি প্রাইজ পাবে!
এটা বুঝি গাবলুর বানানো?
মূর্তিটা দারুন হয়েছে, কিন্তু গাবলু কোথায়?

(তেইশের পাতার পর)

কোরক, হুঁশিয়ার!

খবর্দার!

আমার বাঁধন খুলে দাও!

তুমি কি পালাতে চাও? তাহলে আমার পিছন-পিছন এসো!

তাড়াতাড়ি এসো!

রাস্তায় লোক নেই!

চটপট এই বাগানের মধ্যে চলে এসো!

আরে, মুখটাকে আড়াল করলে কেন?
পরে বলব!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

আটখানা

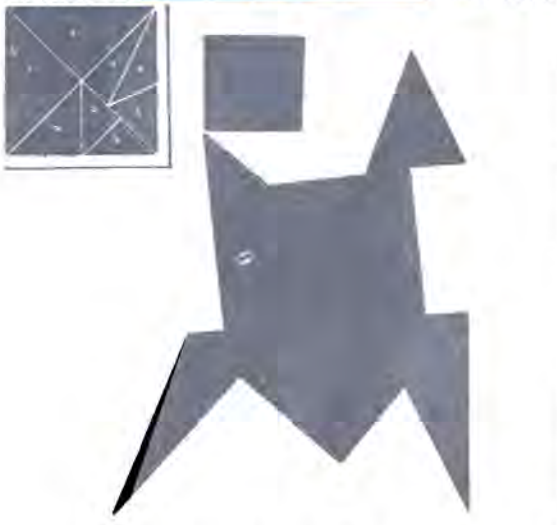

দেখতে দেখতে শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। সন্ধে হলেই রাস্তাঘাট কুয়াশায় ছেয়ে যায়। ঐ সময় অনেকেরই বিছানার ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। আমার সরলকাকা ভীষণ শীত-কাতুরে। আমরা তো সবাই বিছানা দখল করে ফেলেছি আগে আগেই তাই সরলকাকা এদিক-ওদিক তাকিয়ে, যেন কিছু হয়নি এমন ভান করে একটা বই হাতে নিয়ে রান্নাঘরের উনুনের পাশের একটা চারপেয়েতে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে বই পড়তে লাগলেন। সরলকাকাকে আমি ঝটপট আটটা টুকরো দিয়ে তৈরি করে ফেললাম তোমাদের জন্যে। এবার তোমাদের পালা—দেখো তৈরি করতে পারো কিনা।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

২৮ অসিত পাল

ধাঁধা

আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে দেখতে-দেখতে একটা বড় ব্যাঙ্ক একটা জমকালো শাখা-অফিস খুলে ফেলল। দারুণ ঝকঝকে বাইরেটা, ভেতরটাও তেমনই সুন্দর সাজানো-গোছানো।

ছোটকা প্রথম দিন গিয়েই একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেছে। "বাড়ির উল্টোদিকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না খোলাটাই বোকামি"—ছোটকা যাবার আগে বলে গেল। আর ব্যাঙ্ক থেকে একবার ঘুরে এসে যা বলল, তা নিয়েই একটা সুন্দর ধাঁধা হতে পারে। এবারের ধাঁধা তাই ব্যাঙ্ক নিয়েই শুরু হোক।

প্রথম ধাঁধা ॥ হেড ক্লার্ক ম্যানেজার, অডিটর এবং অ্যাকাউন্টান্ট—এই চারটেই ব্যাঙ্কের সব থেকে বড়ো পোস্ট। এই চারটি পদে কাজ করেন যে-চারজন লোক তাঁরা হলেন, পদবী অনুসারে, শ্রীযুক্ত জানা, শ্রীযুক্ত শর্মা, শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি এবং শ্রীযুক্ত দস্তিদার। কে কোন্ পোস্টে কাজ করেন তা কিন্তু এই নাম-সাজানো থেকে ধরা যাবে না, কেননা এলোমেলো ভাবে বলা হয়েছে।

ব্যানার্জি অডিটর এবং হেড ক্লার্ক-এর থেকে লম্বা। ম্যানেজার নিজের গাড়িতে চেপে একলা ও আলাদাভাবে অফিসে আসেন। জানা শর্মার সঙ্গে তাস খেলেন। চারজনের মধ্যে সব থেকে লম্বা যিনি তিনি একজন প্রাক্তন ক্যারম-চ্যাম্পিয়ন। দস্তিদার, অডিটর ও হেডক্লার্ক—এই তিনজন অফিসের গাড়িতে একসঙ্গে যাতায়াত করেন। শর্মা অডিটরের থেকে বয়সে বড়ো। ব্যানার্জির খেলাধুলায় কোনো উৎসাহ নেই।

এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে বলতে হবে, কে কোন্ পদে কাজ করেন।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এমন একটা তিন-অঙ্কের সংখ্যা বলতে পারো যা থেকে ৭ বিয়োগ দিলেও সংখ্যাটিকে ৭ দিয়ে পুরো ভাগ করা যায়, ৮ বিয়োগ দিলেও ৮ দিয়ে ভাগ করা যায় সম্পূর্ণভাবে, এমন-কী, ৯ বিয়োগ দিয়েও সংখ্যাটি ৯ দিয়ে পুরো বিভাজ্য থাকে ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ একজন ম
টাকা মিলিয়ে হাতে পেয়েছে
টাইমের থেকে তার মাইনে ১
টাইম হিসেবে কত পেয়েছে

চতুর্থ ধাঁধা ॥ নীচের প্রশ্ন
করো। তারপর পরের সংখ্যা
মধ্যে কত বসবে, তা বার কর
১৭ (১১২
২৮ (?

গতবারের উত্তর ॥

(১) প্রথম গুচ্ছ থেকে
গুচ্ছে মিশিয়ে দিতে হবে। ি
কাঠি, প্রথম গুচ্ছে রইল ৪টি
এবার ৬টি কাঠি নিয়ে তিন-
দ্বিতীয় গুচ্ছে থাকবে ৮টি,
তৃতীয় গুচ্ছ থেকে ৪টি কা
গুচ্ছের ৪টি কাঠির সঙ্গে
৮টি করে কাঠি হয়ে যাবে

(২) যদি ধরে নেওয়া যা
মেয়ে গিয়েছিল পিকনিকে,
৬০ পয়সা + ৩০ পয়সার
চল্লিশ গুণ। ১০ টাকার অনে
এর কম হলে টাকা আরও বে
হতে পারে ৭০, ৮০ বা ৯০
উঠেছে ১০-এর গুণিতক হবে
হিসেব করলেই দেখা যাচ্ছে, ৮
১৬-জন বয়স্ক পুরুষ ও ৪
গিয়েছেন। (৩) পিঠে পিঠ
(৪) ৪৮ (অন্য সংখ্যাগুলো
সত্যসন্ধ

ছবি অহিভূষণ মালিক

ক্জন মাইনে আর ওভারটাইমের
পয়েছে ১৩০ টাকা। ওভার-
ইনে ১০০ টাকা বেশি। ওভার-
য়েছে সে, মাইনেই বা তার কত ?
র প্রথম সংখ্যাটি মন দিয়ে লক্ষ
সংখ্যাটির ক্ষেত্রে বন্ধনী চিহ্নের
র করতে হবে।
(১১২) ৩৯
(?) ৪৪

থকে ৭টি কাঠি নিয়ে দ্বিতীয়
বে। দ্বিতীয় গুচ্ছে হল ১৪টি
ল ৪টি। দ্বিতীয় গুচ্ছ থেকে
তিন-নম্বর গুচ্ছে দিতে হবে।
৮টি. তৃতীয়তে হবে ১২টি।
৪টি কাঠি নিয়ে এরপর প্রথম
চ্ছে মেশালেই তিনটি গুচ্ছে
বে।

ওয়া যায় ৬০ জন ছোট ছেলে-
মেয়ে, তাহলে মোট আদায় হত
পায় (বড়োদের ন্যূনতম চাঁদা)
র অনেক বেশি হয়ে যায়। ৬০
ও বেশি হবে। ৬০ বেশি হলে
। ৯০ (যেহেতু পুরো ৯০ টাকা
ক হবে ছোটদের সংখ্যা)। একটু
চ্ছে ৮০ জন ছোট ছেলে মেয়ে,
ও ৪ জন মহিলা পিকনিকে
পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে সম্ভবপর।
গুলো ১১ দিয়ে বিভাজ্য)।

কিসের ফটো

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো: তপন দাশ

গতবারে ছিল অশ্বারোহী পুলিসের পাগড়ির ঊর্ধ্বাংশ

কিসের ছবি

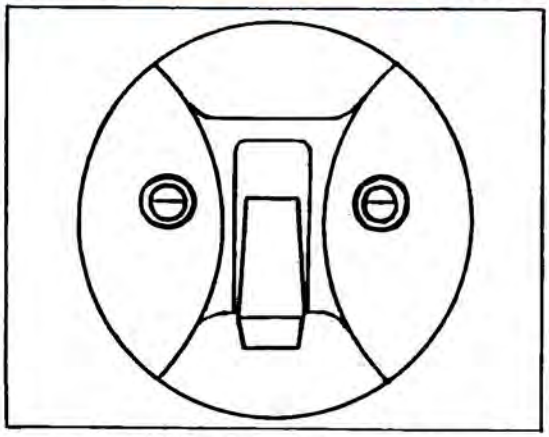

এবারের ছবিটা অদ্ভুত এক জন্তুর মুখ মনে হচ্ছে কি? আমি জানি কেউ কেউ বলছ, ধরে ফেলেছি এ আর এমন কী, এ তো প্যাঁচার মুখ, মেজাজে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। এবার আমার কথা শোনো, খুব মন দিয়ে ছবিটা লক্ষ করো। দেখবে—প্যাঁচার মুখ এত গোল হয় না। আর নাকটাও অমন হয় না, একটু ছুঁচলো হয়। এ ধরনের মুখের সঙ্গে টিয়া পাখির মুখের বেশ মিল আছে, কিন্তু তারও যে নাকটা বেশ ছুঁচলো। তবে? তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে এমন সব জিনিসপত্র আছে যেগুলো নিয়ে একটু ভাবলেই ওদের মধ্যে মানুষ, পশু, পাখির আদল দেখতে পাবে। এবারের ছবিটা হল ঐরকমই একটা জিনিস। সুইচ বোর্ডের একটা সুইচ অন করা আছে। দুদিকের বন্ধ চোখের মতো বস্তুটি হল দুটো স্ক্রু। ছবিটা সুইচের সামনে থেকে দেখা।

চিত্রপাল

শব্দ-সন্ধান

১				■	২	৩
	■	■	■	৪	■	
	■	■	■		■	
■	৫	৬	■	৭		■
৮	■		■	■	■	৯
	■		■	■	■	
১০		■	১১			

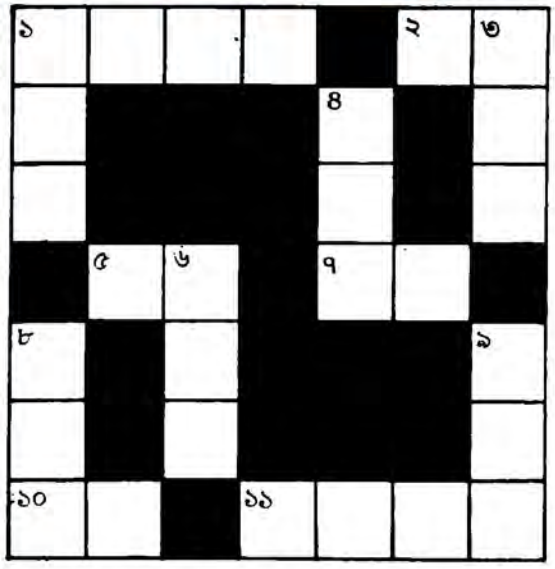

আগে তোমরা একটা 'জান্তব' অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার নিয়ে শব্দ-সন্ধান করেছ। ওইরকম আর-একটা দেওয়া হল। তবে একটু তফাত আছে, এবারের নামগুলির বেশির ভাগই পরিচিত জন্তুর অপ্রচলিত পোশাকী নাম। সিংহ-কে কেশরী বলার মতো ব্যাপার আর-কি !

সংকেত : পাশাপাশি : (১) গাছের ডালে ডালে বিচরণ করে। (২) পুজো-পার্বণে বলি দেওয়া হয়। (৫) এক অর্থে দুর্গা, আর-এক অর্থে এমন জন্তু যাদের সবাইকার এক রা (৭) দশাসই চেহারা। (১০) গৃহপালিত পশু। (১১) দিনের পর দিন জল না খেয়ে থাকতে পারে।

উপর-নীচ : (১) সুন্দরবনের শোভা। (৩) অভয়ারণ্যে এরা নির্ভয়ে চলাফেরা করে। (৪) পক্ষিরাজ হলেই ভালো, তবে রূপকথায় ছাড়া কোথায় পাব তারে ? (৬) পাশাপাশি সাত নম্বরের নামান্তর। (৮) চার নম্বরের আর-এক নাম। (৯) পাশাপাশি পাঁচ নম্বরেও যা, এখানেও তাই।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

১ক	ট	২ক	■	৩ন	রু	৪ন
থ	■	ন	■	ন্দ	■	র্ত
৫ক	ণ্ট	ক	■	৬ন	য়	ন
■	■	■	■	■	■	■
৭ন	বী	৮ন	■	৯স	ই	১০স
লি	■	ম	■	ন্ন্যা	■	ত্রা
১১ন	তু	ন	■	১২স	মা	স

টিনটিন লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

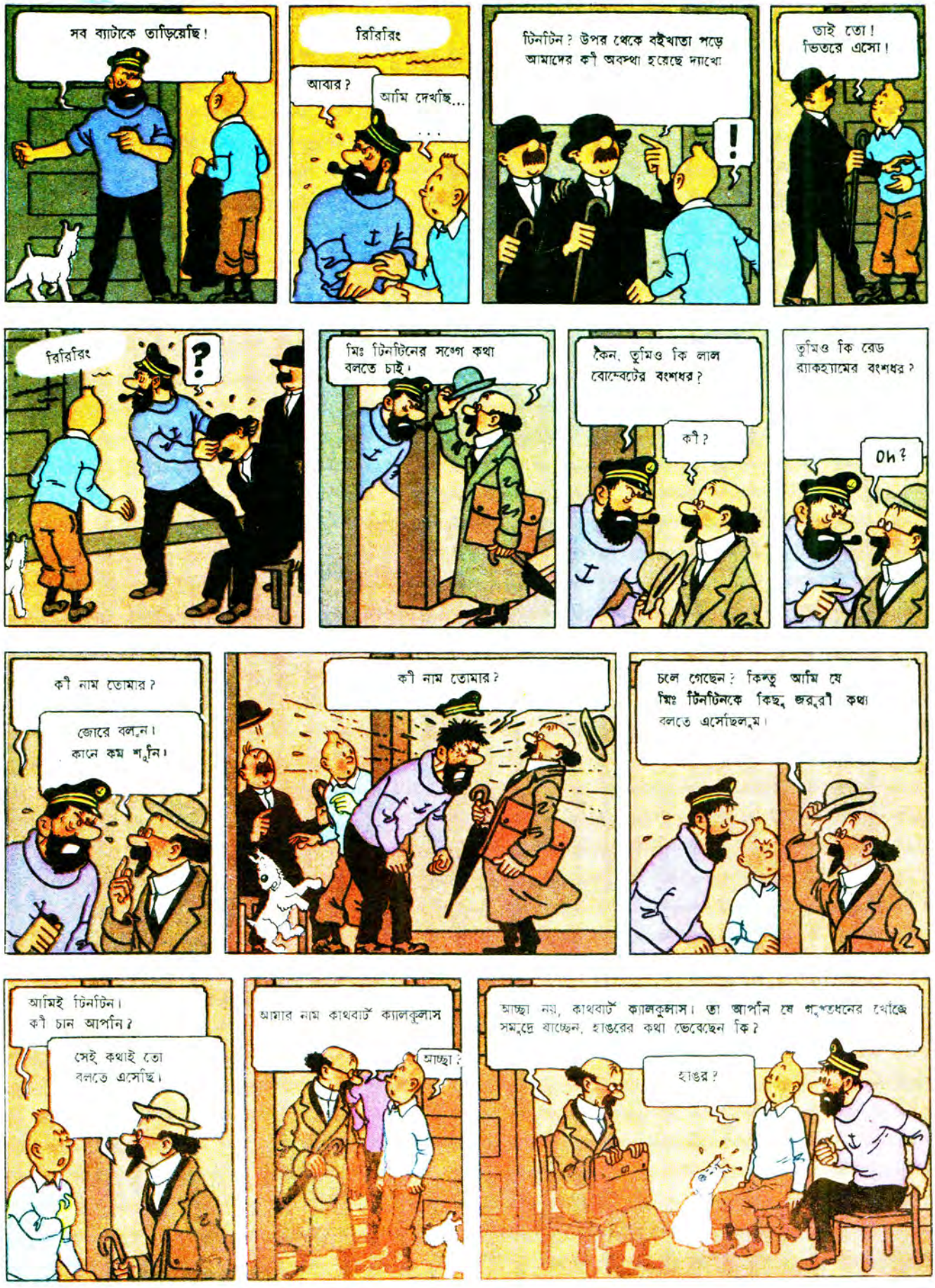

না না, হাঙরের কথা বলছি। আপনারা তো ডুবুরী হয়ে জলে নামবেন তখন হাঙর এলে কী করবেন ভেবেছেন?

কিন্তু....

সেইজন্যেই আমি এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছি, যাতে হাঙরের ভয় থাকে না। সেটা আপনাকে দেখাব।

কিন্তু আমি যে...

আমার বাড়ি খুব কাছেই...

কিন্তু আমি এখন খুব ব্যস্ত...

বেশ তো, ও'রাও আসুন না!

সময় নেই! সময় নেই!

বেশ তো, তাহলে চলুন।

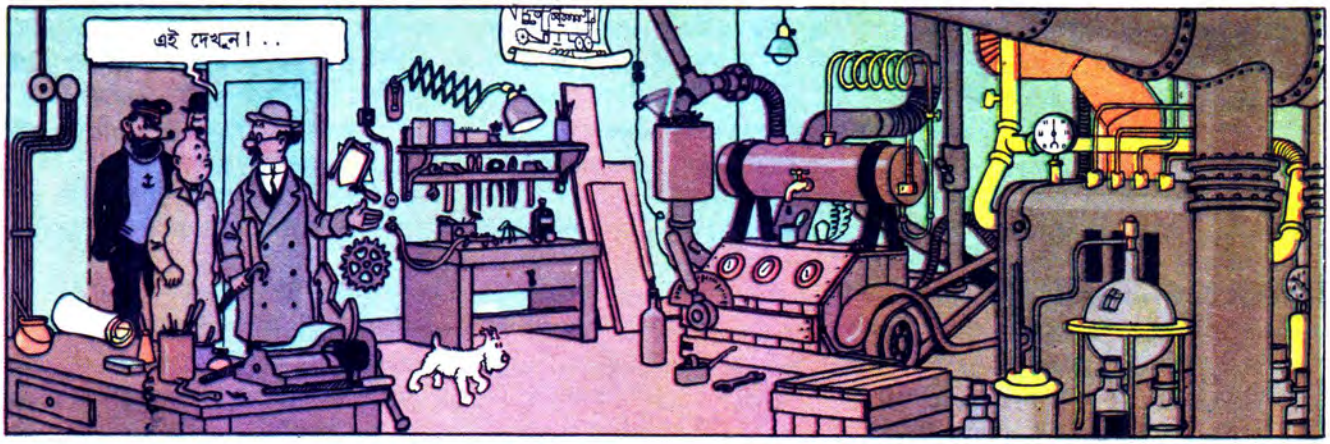

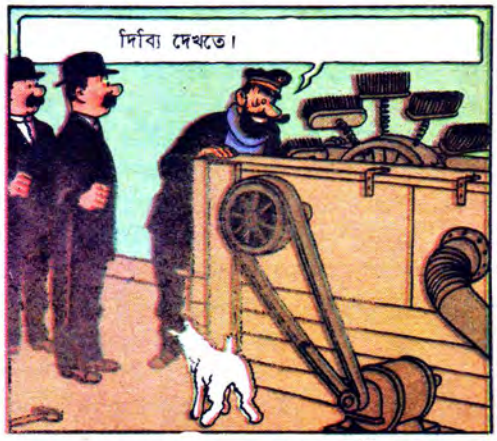

(এরপর চৌত্রিশের পাতায়)

হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

প্রাচীন মানেই ঐতিহ্যশালী নয়। তবে, কিছু-কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি একই সঙ্গে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যশালী। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল (প্রতিষ্ঠা ১৮১২) এইরকম একটি বিদ্যায়তন।

এই বিদ্যালয়ের অজস্র কৃতী ছাত্রের মধ্যে ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার সৈয়দ আমীর আলি ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এখানে যাঁরা একদা শিক্ষকতা করেছেন তাঁদের খ্যাতিও ছিল রাজযোড়া। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন টোয়েন্টিম্যান, গ্রেভস, গুড, ক্যান্টেফার, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় মিত্র, শিবচন্দ্র সোম, বরদাপ্রসাদ ঘোষ ও মহঃ আজিজুল হক। "১৯৬০-এর উচ্চ-মাধ্যমিক থেকে শুরু করে গত মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা বরাবরই শতকরা ১০০ ভাগ সাফল্য অর্জন করেছি। গত পরীক্ষায় আমাদের একটিও তৃতীয় বিভাগ ছিল না", বললেন স্কুলের অন্যতম স্তম্ভ শিক্ষক অসিত ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্যই জানালেন, এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সুধীরঞ্জন প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সপ্তম শ্রেণীর অরূপরতন চৌধুরী পুরস্কার পেয়েছে নেদারল্যান্ডে, ফিনল্যান্ডে।

প্রধান শিক্ষক শ্রীমোহিতমোহন ঘোষ বর্তমান পদে এগারো বছর আসীন হলেও এই বৃত্তিতে ২৭ বছর নিযুক্ত। বিষয় ইংরেজি। কথায় কথায় বলে ফেললেন, হাজারিবাগের বিখ্যাত সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ-এর ইংরেজি শিক্ষণের ডিপ্লোমা তাঁর আছে। শুরু করে দিলাম ইংরেজি নিয়ে আলোচনা। কেন এত ফেল করে, জানতে চাইলাম।

উনি বললেন, "বলছেন কী? ফেলের সমস্যা! বর্তমান সিলেবাসে ইংরেজিতে পাশ করানোর এত রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে ফেল করাটাই এখন আশ্চর্য! তা সত্ত্বেও ফেল করে কেন? প্রাথমিকে জোর না দিয়ে মাধ্যমিকে তেড়ে ধরে লাভ হয় না। আর আমাদের ডাইরেক্ট মেথড ব্যবহার না করে ট্রানস্লেশন মেথড ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ছেলেমেয়েদের মন থেকে মাতৃভাষার প্রভাব দূর হয় না। আমরা ভুলেই যাই যে ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের গঠনই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সবচেয়ে বড় কথা, সহজ সহজ অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন, যেমন হোয়াট, হু, হাউ, হোয়াই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর একটি দুটি সেন্টেন্সের মাধ্যমে লিখতে লিখতে বা 'বাজার-নোট' পড়ে ছেলেরা উতরে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের ইংরেজি লেখার ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে না। কারণ বেশি লিখতে গেলেই যুক্তিবদ্ধ চিন্তাধারার প্রয়োজন। প্যারাগ্রাফ, লেটার এইসব বড় লেখা লিখতে গেলেই ক্ষমতার দৈন্য ধরা পড়ে যায়।"

"তাহলে কি বেশি লেখা..."

"না, না। বেশি লেখার অভ্যাসও খারাপ। কিছু ভাল ছেলের একটা ঝোঁক আছে বেশি লেখার। হয়ত প্রশ্নপত্রে দুটি সেন্টেন্সে উত্তর লিখতে বলা হয়েছে। নিজে ভাল লিখতে পারে বলে সেখানে সাতটা সেন্টেন্স লেখাটা কোনো কৃতিত্ব নয়। বরং সেই বাড়তি লেখাটা শুদ্ধ হলেও নির্দেশ লঙ্ঘনের জন্যে নম্বর কাটা যাবে।

"বাংলায় ফেলের সংখ্যা ইংরেজির থেকে অনেক কম। কিন্তু বাংলায় খুব উঁচু নম্বর বড় একটা ওঠে না। কদাকার হাতের লেখা, জঘন্য বানান ভুল ছাড়াও এর কারণ আছে। সংস্কৃতের উপর বাংলা ব্যাকরণের নির্ভরশীলতার জন্যে ছাত্রদের কাছে বাংলা ব্যাকরণও ভয়াবহ। 'কৃষক' কথাটি অশুদ্ধ, সে আর কজন জানে? অথচ গোঁড়া সংস্কৃতপন্থী পরীক্ষকের হাতে পড়লে ওর জন্যে নম্বর কাটা যেতেই পারে। আর একটা কথা, নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে বাংলার পরীক্ষকরা বোধ হয় একটু বেশি কঠোর। কেন, জানি না।"

"বাংলায় ভাল নম্বর তুলতে কী চাই?"

"নিছক শুদ্ধ লেখা নয়। একটা নিজস্ব রচনাশৈলী—যা একটা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর কাছে নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে। টেক্সট ছাড়াও বাইরের বই, পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং স্কুলের ম্যাগাজিনে বা অন্যত্র লিখে লেখার চর্চা করতে হবে—যথার্থ 'নিজের' লেখা, পাঁচটা বই মিলিয়ে একটা কিছু লিখে দেওয়া নয়। আর বানান সম্পর্কে সংশয় জাগলেই তা তখনই দূর করতে চলন্তিকা বা ঐ স্ট্যান্ডার্ডের একটি ভাল অভিধান ব্যবহার করতে হবে।"

অঙ্ক সম্পর্কে শ্রীঘোষ বলেন, যাতে ছেলেমেয়েদের অঙ্কের ভিত শক্ত হয় তার জন্য দরকার নিচু ক্লাসগুলিকেই সেরা-সেরা অঙ্ক শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দেওয়া। আর হোম ওয়ার্কের বদলে চাই যতটা সম্ভব ক্লাসে অঙ্ক করতে দিয়ে সেটা সেখানে দেখে দেওয়া—লেখাটা তাতে ভাল হয়। আর একটা দরকারি জিনিস হল, কোনও প্রশ্নমালার কোনও অঙ্ক বাদ না দেওয়া।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রীঘোষের বক্তব্য : যথাসম্ভব বেশি বই পড়তে হবে। "এ সম্পর্কে আনন্দমেলার ক্যাম্পেনিং প্রশংসনীয়।" ল্যাবরেটরিতে এক ঘন্টা কাজ তিনটে চ্যাপ্টার পড়ার সমান কাজ দেয়। তাই পাঠক্রমে আবশ্যিক না হলেও

ল্যাবরেটরির ব্যবহার নিয়মিতভাবে করতে হবেই। ড্রয়িং, স্কেচ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া নিয়ে তো অনেক কথাই বলা হয়েছে।

ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীঘোষ বললেন, "যেসব অবজেকটিভ প্রশ্ন আজকাল এই বিষয় দুটিতে দেওয়া হচ্ছে সেগুলি থেকে পুরো নম্বর তুলতে হলে কোনও একটি নামকরা সাধারণ জ্ঞানের বই থেকে ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোলের প্রয়োজনীয় অংশ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়মিত অভ্যাস করা দরকার। ওটা দারুণ কাজ দেয়। ভূগোলে ভাল নম্বর তুলতে গেলে ম্যাপ নিয়ে পড়া তৈরি করা ও উত্তরে ম্যাপ আঁকা এবং প্রাকৃতিক ভূগোল আয়ত্ত করা অবশ্যই চাই। পাট গুজরাটের বদলে পশ্চিমবাংলায় আর তুলো পশ্চিমবাংলায় না জন্মে গুজরাটে জন্মাচ্ছে কেন, লৌহ কারখানা ২৪ পরগনায় না গড়ে উঠে জামসেদপুরেই গড়ে উঠেছে কেন—এসবের মূল রহস্য বুঝতে হলে প্রাকৃতিক ভূগোল অধিগত করতেই হবে। মুখস্থ করে ওটা হয় না। আবার ধরুন, অঙ্কের মত একটা নদী উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পর্কে কেউ তৈরি করল, কিন্তু জানল না সেতু কতরকম হয়, বাঁধই বা কতরকমের, ফরাক্কা নিয়ে গোল-মালটা কী। ইতিহাসের বিষয়ে আর একটা কথা। ইতিহাসে ভাল নম্বর তুলতে হলে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ভাষার উপর দখল ও রচনাশৈলী প্রয়োজন। নিছক ঘটনাক্রম দিয়ে উত্তর লিখতে গেলে সেটা একটা জমা-খরচের খাতায় দাঁড়িয়ে যাবে না?"

"সংস্কৃত? ও বিষয়টা অঙ্কের মতো। কয়েকটা জিনিস শিখে রাখলেই পাশ—যেমন বিশেষ কয়েকটা শব্দ ও ধাতুর রূপ, ভুল সংশোধন, রেজাল্টিং ফর্ম ইত্যাদি। আর বাংলা ভাষায় মাঝামাঝি ধরনের দখল থাকলেই বুদ্ধি করে সাধু বাংলা লিখে লিঙ্গ, বিভক্তি বচন কাল ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ করে অনুবাদ থেকেও বেশ কিছু নম্বর বার করে আনা সম্ভব। কিন্তু ভাল নম্বর তুলতে গেলে টেস্টপেপার্স ও অন্যান্য বই নিয়ে রীতিমত অভ্যাস দরকার। সেক্ষেত্রে ধাতুরূপ-শব্দরূপ নখদর্পণে রাখতে হবে, না হলে ট্রান্সলেশনে পুরো নম্বর আসবে না। ভাল ছাত্রদের সিলেবাসের গণ্ডীর বাইরেও যেতে হবে।"

"কীরকম?"

যেমন বাচ্যান্তর লিখতে হবে।"এটা সিলেবাসে নেই। কিন্তু অনুবাদে অনেক কাজ দেয়। এখানেই ধরা পড়ে সংস্কৃতে কার কত দখল। আর একটা কথা। সংস্কৃতে হসন্ত বিসর্গ, রেফ প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। ভাল সাধারণ সব ছাত্রকেই।"

সব শেষে মোহিতবাবু বললেন, "দেখুন, মাধ্যমিকে যে সত্যিই ভাল ফল করতে চাইবে তাকে সব বিষয়েই নম্বর তুলতে হবে। সাধারণত আমরা দেখি, যে ছেলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে ভাল, সে কলার বিষয়গুলিতে কাঁচা। কিংবা তার উলটোটাও হয়। এতে সামগ্রিক ফল ভাল হয় না। পরে যে যা হবে তা হোক না, সব বিষয় নিয়েই যখন পরীক্ষা তখন সব কিছুতেই ভাল করতে হবে।"

অবশ্য উনি স্বীকার করলেন, একটি বিষয়ে ভাল নম্বর পাওয়ায় ছাত্রের চেয়ে ভাগ্য বা ভগবানের হাতই বেশি দেখা যাচ্ছে—ওয়ার্ক এডুকেশনের পেপারটা। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হেসে বললেন, "কারণটা কারুরই অজানা নেই।"

আর কোনও মন্তব্য করতে রাজি হলেন না তিনি।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

সুব্রত রায় আগে পড়ত সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। ক্লাস এইট থেকে হুগলী কলেজিয়েটে পড়ছে। নতুন স্কুলে এসেই সে একবার সেকেন্ড হয়েছিল, তারপর থেকে বরাবরই ফার্স্ট। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় ওর নম্বর শতকরা ৭৭। ফাইনালে সুব্রত ৮০০-র ওপর নম্বর রাখবে বলে আশা করে।

"তার জন্যে তুমি কীভাবে তৈরি হচ্ছ?"

"সকালের দিকে তিন ঘণ্টা ও রাতে চার ঘণ্টা পড়ি। যে কোনও বিষয়েই প্রথমে স্কুলের নির্বাচিত বই বা টেক্সট পড়ি, তারপর নোট কিংবা উঁচু ক্লাসের বই পড়ে একটা অধ্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলি। তারপর টেস্ট পেপার্স থেকে প্রশ্ন বেছে বেছে উত্তর করি। এইসব উত্তর দেখে দেন কখনও স্কুলের শিক্ষকরা, কখনও বা গৃহশিক্ষক।"

কলা বিষয়গুলির চাইতে বিজ্ঞান বিষয়গুলির প্রতিই সুব্রতর আকর্ষণ বেশি। তবে ওর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হল অঙ্ক। অঙ্কে সুব্রত কে পি বসুর বই আর টেস্ট পেপার্স ব্যবহার করে। ঐচ্ছিক অঙ্কে কেশবচন্দ্র নাগ।

"ফিজিক্যাল ও লাইফ সায়ান্সে কী পড়?"

"ফিজিক্যালে স্কুলে পড়ানো হয় মুখোপাধ্যায়-বাজপেয়ী। এছাড়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই, ফিজিক্সের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত আর কেমিস্ট্রির জন্যে দিগ্বিজয় দত্তের বই পড়ি। লাইফ সায়ান্সে স্কুলের বই ডঃ অমলকুমার চক্রবর্তী। এছাড়া পড়ি কুঙ্কু-দাশ-কুঙ্কু আর একাদশ শ্রেণীর জন্যে সীমানন্দ অধিকারীর বইটি।

সুব্রত ইতিহাসে বুকলিস্টের বই (ডঃ অতুলচন্দ্র রায়) ছাড়া ডঃ কিরণ চৌধুরীর বই পড়ে। ভূগোলে পড়ে লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও একাদশ শ্রেণীর জন্যে বসু ও ভট্টাচার্যের অর্থনৈতিক ভূগোল।

ইংরেজি গ্রামারের জন্যে সুব্রত স্কুল-নির্বাচিত স্টেপ্স অব গুড ইংলিশ (এন সি মুখার্জী) পড়ে। এছাড়া একাদশ শ্রেণী ও পুরনো উচ্চ-মাধ্যমিকের ভাল ভাল বই, যেমন এ সি সেন, ব্যোমকেশ ঘোষ ও পি মাহাতো, পড়ে। আর ব্যবহার করে "কমন ওয়ার্ডস" বইটি।

আনন্দমেলার নিয়মিত পাঠক সুব্রত পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত প্রধান পরীক্ষক-দের পরামর্শগুলি মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করছে। 'লেখাপড়া' বিভাগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে বলল, "ওটা তো পড়তেই হয়।"

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

(একত্রিশের পাতার পর)

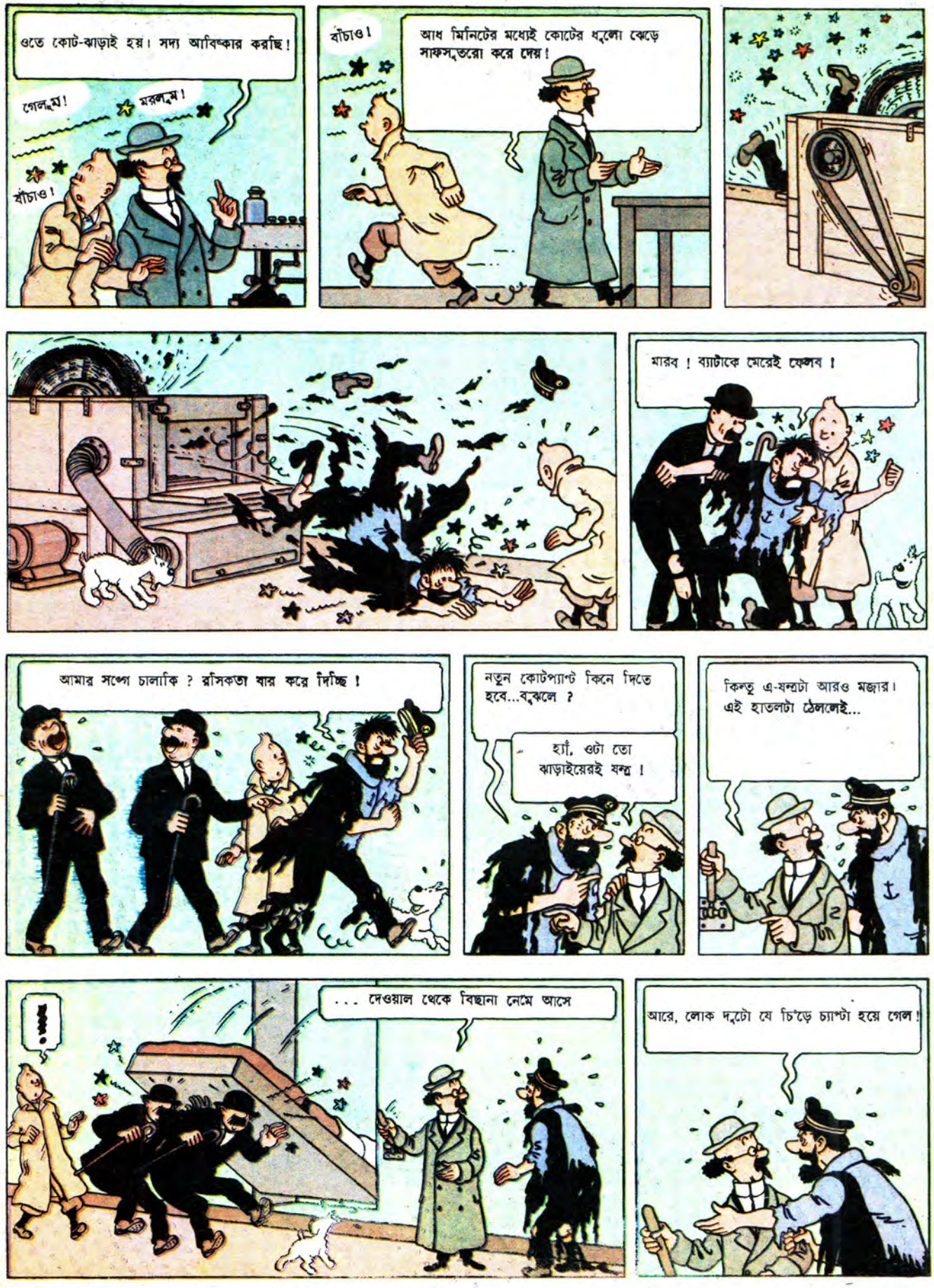

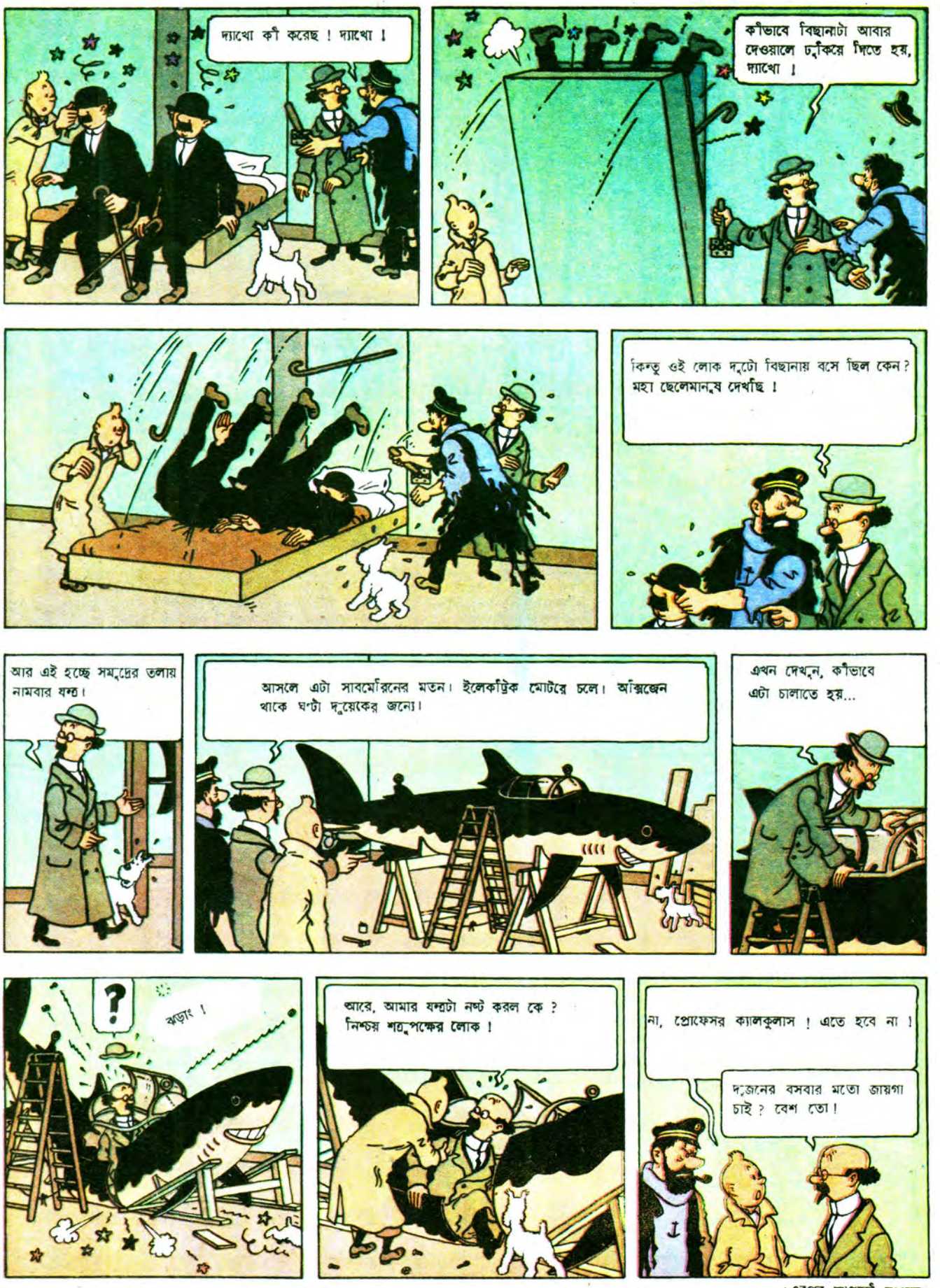

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

শিশুদের–কিশোরদের—মত ছোটদের বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আসলে কবি হলেও, আজকের দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন গল্প-উপন্যাস লেখকও। তা কি বড়দের, কি ছোটদের। এ পর্যন্ত গুটিকয়েক মাত্র রহস্য বা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ছোটদের জন্যে তিনি লিখেছেন, তাতেই বাজীমাত করে ছেড়েছেন। তাঁর সেইসব বইঃ

তিন নম্বর চোখ ৫·০০ ভয়ংকর সুন্দর ৪·০০ দস্যি রাজপুত্র ৫·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·০০
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেলকি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কুন্টাল ১০·০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫,০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০

তপন চরিত ৫·০০
মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ ০০
ঝাঁকিদর্শন ৬·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিনকুর ডাইরি ৪·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ৪·০০
লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
গিরিধারী কুণ্ডু
টংসো চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা আর মানিকের একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। বন্ধু মানিক এসে পৌঁছতে পারেনি। বরদা একাই বসে ছিল সিনেমায়। তার পাশে এসে বসল অচেনা এক ভদ্রলোক। সিটে বসে-বসেই লোকটা কখন যেন মরে গেল। সিনেমা ভাঙার পর বরদা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। নীচে মানিকের সঙ্গে দেখা। সামান্য পরে দেখা গেল, মরা লোক জ্যান্ত হয়ে দিব্যি চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। বরদা আর মানিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

এই অদ্ভুত মানুষটির নাম সিদ্ধেশ্বর। আলাপ করার পর তিনি বরদাদের তাঁর বাড়িতে আসতে বললেন পরের দিন বিকেলে।

সিদ্ধেশ্বরের সুদর্শন ফ্ল্যাটের বাড়িতে গিয়ে বরদারা জানল, ভদ্রলোক এক গবেষণার কাজ নিয়ে রয়েছেন। কোনো কোনো মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এক শক্তি থাকে। সেটা কেমন করে হয়—এই তাঁর গবেষণার কাজ। অবশ্য এই সব গবেষণা কলকাতার বাড়িতে হয় না—বাইরে দুমকার দিকে একটা সেন্টার আছে, সেখানেই হয়।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে দুমকা যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। বরদা মনস্থির করতে পারছিল না। শেষে সিদ্ধেশ্বর বরদাকে একটা ফোটো দেখালেন। বরদা অবাক হয়ে দেখল, ফোটোটার লোকটা অবিকল তার মতন দেখতে। সিদ্ধেশ্বর বললেন, এই লোকটা জাল-জুচ্চুরি করে তাঁদের 'সেন্টারে' ঢুকে পড়েছে। বরদা যদি তাঁর সঙ্গে দুমকায় যায়—এই ঠগ লোকটাকে তিনি জব্দ করতে পারবেন। বরদা রাজী হয়ে গেল। তারপর—

৫

দুমকা নয়, দুমকার কাছাকাছি। মানিক থাকলে এতক্ষণে নাচত, বলত—ফার্স্ট ক্লাস জায়গা রে! সত্যি চমৎকার, চোখ জুড়িয়ে যাবার মতন। বরদা কলকাতার পোকা ; জন্মকর্ম খাস কলকাতায়, দু পুরুষ ধরে উত্তর কলকাতার বাসিন্দে। কলকাতায় থাকতে-থাকতে চোখের ওপর কেমন একটা পরদা পড়ে যায়, গলি রাস্তা ফুটপাথের দোকান ট্রাম বাস দেখতে-দেখতে এমন হয়ে যায় চোখের অবস্থা যে, আলো রোদ মাঠ গাছপালা কিছুই যেন আর সইতে চায় না চোখে।

বরদা বেশ বুঝতে পারছিল তার চোখের ময়লা পরদাটা পুরোপুরি কেটে যাচ্ছে। ওরা রামপুরহাটে নেমেছিল শেষ বিকেলে। সিদ্ধেশ্বর একলা এলে আগেই আসতেন। বরদার জন্যে একটা দিন পিছিয়ে দিলেন, দিয়ে বরদাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন।

রামপুরহাট থেকে বাস। কলকাতার মতন নয়, দেখলেই বোঝা যায় মফস্বলের বাস। তবু সিদ্ধেশ্বর বেশ খাতির পেলেন। চেনাজানা লোক তিনি। বাস-বোঝাই যাত্রীর মধ্যেও বরদাদের বসার ভাল জায়গা জুটেছিল।

বরদা কলকাতার পোকা হলেও দু এক বছর অন্তর বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছে। কখনো পরিবারের লোকজনের সঙ্গে, কখনো বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে। মধুপুর, দেওঘর, গিরিডি তার দেখা ; সে হাজারিবাগের জঙ্গলেও ছিল এক রাত। কাজেই এই নতুন জায়গা একেবারে অচেনা ঠেকল না। সেই রকমই ধুধু উঁচুনিচু মাঠ, রাশি রাশি গাছ, ছোট ছোট বালিয়াড়ির মতন স্তূপ, আর টাটকা বাতাস যেন চারদিকে আপন খেয়ালে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাতাস, মাটি, গাছপালার গন্ধই কী সুন্দর।

বাস থেকে নামতে-নামতে বিকেল পড়ে গেল।

মালপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। বরদা একটা লম্বা-চওড়া সুটকেস নিয়েছে মাত্র। সিদ্ধেশ্বর বলেছিলেন, বিছানাপত্র নেবেন না—সব ব্যবস্থা রয়েছে। বরদা জামা-কাপড় আর কিছু টুকিটাকি নিয়ে সুটকেসটা ভরিয়ে ফেলেছে। সিদ্ধেশ্বর নিজেও অনেকটা ঝাড়া-হাত-পা মানুষ, তাঁর হাতে একটা চামড়ার কিট-ব্যাগ।

বাসটা চলে গেল দুমকার দিকে।

সিদ্ধেশ্বর একটা টাঙা ভাড়া করলেন। বাস থামার জায়গাটাকে ঘিরে গ্রাম-গ্রাম লাগল। দু-চারটে পাকা বাড়ি ছাড়া বাদবাকি সবই খাপরার-চাল-ছাওয়া বাড়ি। পাঁচ-সাতটা দোকান। একপাশে হনুমান মন্দির। গোটা-দুই মাল-বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে আছে। আলু পিঁয়াজের কেমন একটা গন্ধ আসছিল লরি থেকে।

টাঙায় উঠে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখান থেকে মাইল দুই।"

বরদা কিছু বলল না ; ছেলেমানুষের চোখ করে চারদিক দেখছিল।

টাঙা চলতে শুরু করলে বরদার আবার মানিকের কথা মনে পড়ল। মানিক আসতে পারল না। বরদা একলা আসে এটাও তার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কিন্তু সব কথাবার্তা শুনে সে শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়ে বলল, "ঠিক আছে, তুই যা। আমিও পরে আসব। কোনো ঝামেলা বুঝলে চিঠি লিখবি, আমি সুশোভনকে সঙ্গে করে চলে যাব।"

সুশোভন বরদাদের আর-এক বন্ধু। দারুণ ছেলে। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি সাহস। পুলিসে চাকরি করে।

বরদা অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরাল। তার ঠিক ভয় করছিল না। সে এমন কিছু সাহসী ছেলে নয়, বরং অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। কিন্তু দু-তিনটে দিন সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মেলামেশা করে মানুষটির প্রতি তার কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। সিদ্ধেশ্বর খারাপ লোক নন। মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান না। তবে ওই যে—ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা নিয়ে মাথা ঘামান এটাই যা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। নয়ত অন্য কোনো দোষ তাঁর নেই।

সন্ধের কালচে ভাবটা জমে আসার আগে যেন মনে হল ঝাপসা ভাবটা ফিকে হয়ে আলো ফুটছে। বরদার খেয়াল হয়নি। আকাশের দিকে তাকাতেই চাঁদ চোখে পড়ল, পরিষ্কার চাঁদ, প্রায় গোল; মানে কাছাকাছি পূর্ণিমা।

টাঙাটা নুড়ি পাথরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। চাকার শব্দ। ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ। টাঙার চারদিক থেকে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজও উঠছিল।

বরদা শালবন দেখতে লাগল। সামান্য তফাতে শালের বন। বনের মাথায় চাঁদ। বাতাসে যেন শালপাতার গন্ধ জড়িয়ে আছে।

খুশি হয়ে বরদা বলল, "জায়গাটা ওয়াণ্ডারফুল।..... ওটা শালবন তো?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা দুলিয়ে হাসলেন "হ্যাঁ, শাল। এদিকে শাল আর পলাশই বেশি। অন্য গাছও আছে।"

"আপনারা জায়গাটা ভালই বেছে নিয়েছেন।"

একটু চুপ করে থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, ''বেছে নিয়েছি ঠিক নয়, এক বেহারী ভদ্রলোক—যমুনাপ্রসাদ— আমাদের জায়গাটা এক রকম দানই করে দেন। তাঁর অনেক জমিজায়গা ছিল—মানুষটিও ছিলেন ধর্মভীরু, পরলোক সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা ছিল, অনেক-কিছু বিশ্বাস করতেন তিনি, আত্মাটাত্মা, প্রেতটেত.....। নিজে একটু-আধটু চর্চাও করতেন।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল একবার, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শালবনের তলায় গড়িয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখতে লাগল। হালকা ঠাণ্ডাও লাগছিল।

অন্যমনস্কভাবেই বরদা বলল, "ভূতপ্রেত নিয়ে আবার কেউ চর্চা করে নাকি? আপনিই না বলেছিলেন, ওসব নিয়ে লোক ঠকানো কারবার চলে!"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, ''আমি তা বলিনি। বলেছি, কিছু লোক রয়েছে যারা এ-সব নিয়ে ব্যবসা করে, পয়সা কামায়। আবার কেউ-কেউ আছে যারা সত্যি-সত্যি এর চর্চা করে।"

"সত্যি-সত্যি চর্চা?" বরদা কৌতুকের গলায় বলল। তাকাল আবার সিদ্ধেশ্বরের দিকে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মানুষের নানা খেয়াল থাকে, কৌতূহল থাকে।"

''আপনারা তো ঠিক ভূতপ্রেত চর্চা করেন না?"

"না।"

''মহাদেব দাশ করে?"

''চর্চা করে না; ও কিছু ফন্দি আঁটছে। কিসের ফন্দি তা আমি এখনও ঠিক ধরতে পারিনি। তবে আমার মনে হয়, আমাদের এখানে যারা আছে তাদের দু-একজনকে ও ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে লোক ঠকাবার ব্যবসা ফাঁদবে। পয়সা রোজগার করবে।"

বরদা টাঙার ঝাঁকুনিতে সামান্য গড়িয়ে গিয়েছিল, ভাল ভাবে বসল, বলল, "আচ্ছা সিদ্ধেশ্বরবাবু, সত্যি সত্যি কি মানুষে ভূতের চর্চা করে?"

সিদ্ধেশ্বর যেন হাসলেন একটু, বললেন, ''করে। আমাদের দেশের দু-একজনের নাম আমি শুনেছি। কাশীর কাছে এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, লোকে তাঁকে শুকলজী বলত। আমি তাঁকে দেখিনি। পঞ্চাশ-ষাট সাল আগেই তিনি মারা গেছেন। শুনেছি তিনি বিদেহী আত্মার চর্চা করতেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর বইও ছিল।" সিদ্ধেশ্বর একটু থেমে আবার বললেন, "আরও একজনের কথা শুনেছি, পঞ্চানন সাহানা, বর্ধমান জেলার লোক। তাঁরও নামডাক ছিল, সেও ধরুন বছর ত্রিশ আগে। তিনিও মারা গেছেন।"

বরদা তাকিয়ে তাকিয়ে ছায়া দেখছিল শালবনের। চাঁদের আলো আর ছায়া যেন বনের গা দিয়ে টাঙার সঙ্গে সমানে ছুটছে। আবার কখনও কখনও, বন যেখানে পাতলা, জ্যোৎস্না প্রায় পুকুরের জলের মতন পড়ে আছে। খাসা জ্যোৎস্নাও ফুটেছে আজ। যত রাত বাড়বে, আরও যেন ঝকঝক করে উঠবে চাঁদের আলো।

বরদা বলল, "এ-সব, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, ''আমি জানি না। তবে এটা নতুন কিছু নয়। ভূতই বলুন আর প্রেতই বলুন, এর চর্চা সব দেশেই আছে। হেনরি করনেলিস অ্যাগরিপ্পা বলে কোনো নাম কখনো শুনেছেন?"

শীলা চোখ খুলে দিল

চিত্র-পরাগ রায়
বয়স-১২ বছর

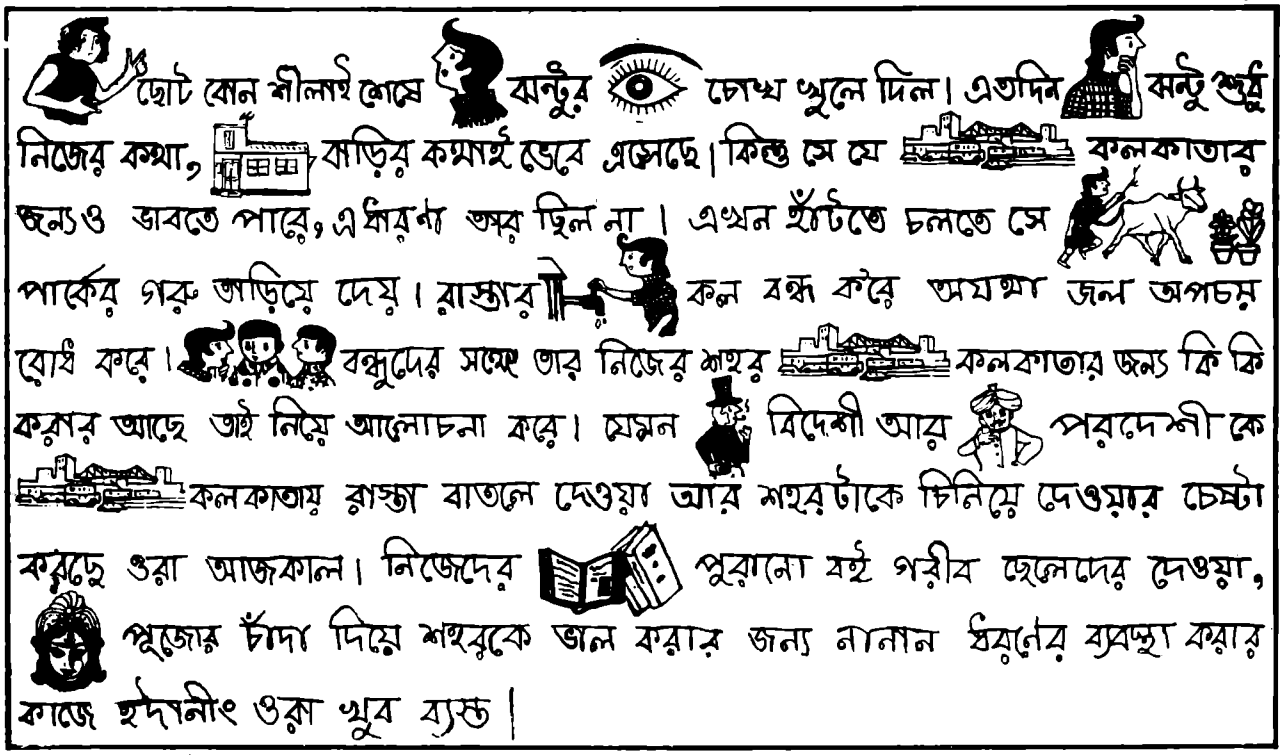

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মন্দে তোমারও ভাল,—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

'সুভানুটি প্রজেক্ট' (বাংলা), 'ক্যালকাটা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার' (ইংরাজী) প্রতিটির দাম এক টাকা। নগদে বা মনিঅর্ডারে সি.এম.ডি.এর অফিস ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ তে পাওয়া যাচ্ছে।

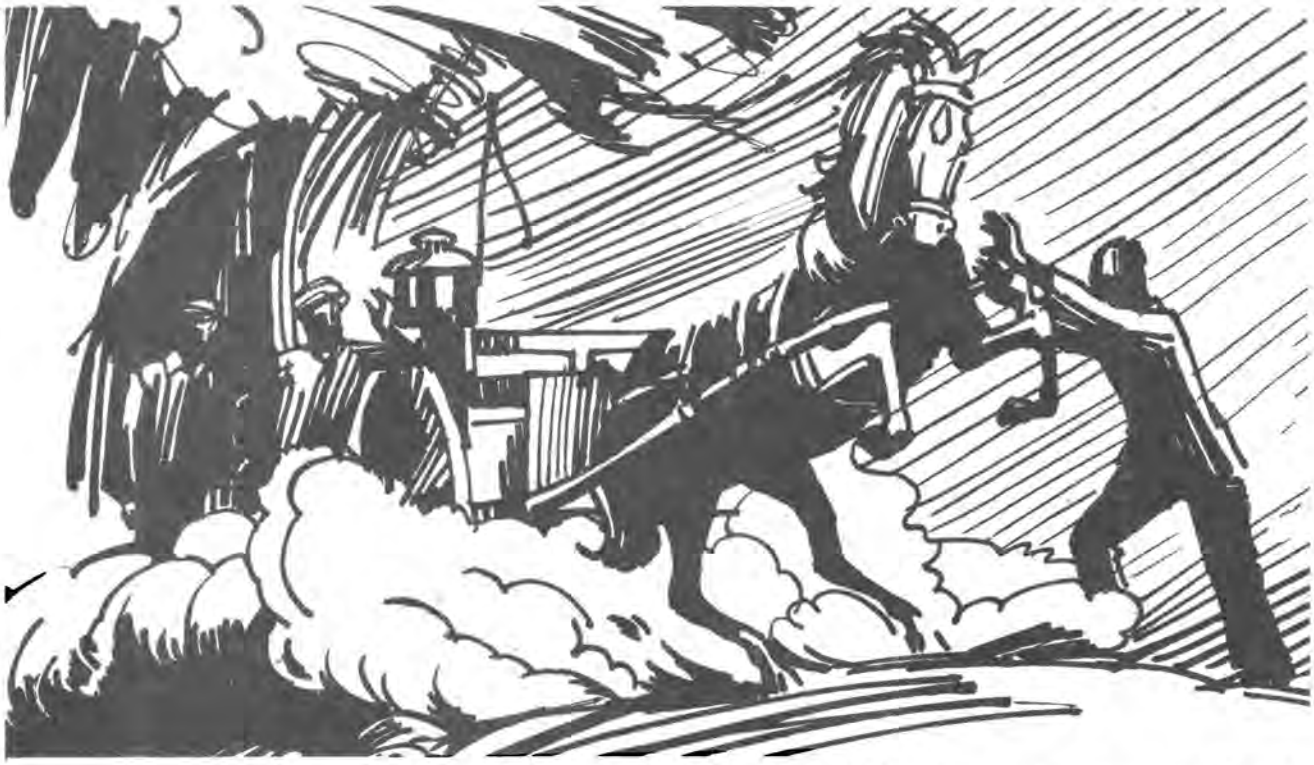

"না।"

"মাদাম ব্লাভেটস্কি?"

"না মশাই, শুনিনি। এঁরা কারা?"

"এঁরা বিখ্যাত অকালটিস্ট। হেনরি করনেলিস ফিফটিনথ্ সেঞ্চুরির লোক। তবে মাদাম ব্লাভেটস্কির নামটাই বেশি শোনা যায়। তিনি নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির।"

বরদা চাঁদের আলো দেখার কথা ভুলে গেল। বলল, "অকাল্টিস্ট? মানে ভূতের—মানে ভূতের কী বলব—ভূতের বিশেষজ্ঞ?"

"না না; ভূতের নয়; বলতে পারেন ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যের যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা। তার মধ্যে প্রেতত্ত্বেও থাকতে পারে।"

বরদা চুপ করে গেল।

রাস্তাটা ছোট, উঁচু-নিচু, রাস্তার পাশে ফাঁকা-ফাঁকা জমি ঝোপঝাড় দু-চারটে গাছ—আর-একটু তফাতেই টানা শাল-জঙ্গল। তবে জঙ্গলটা এখন যেন শেষ হয়ে এল। তেপান্তর মাঠ চোখে পড়ছে, মস্ত একটা টিলা, দু-চারটে কুঁড়েও যেন একপাশে জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।

ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছিল।

বরদার হঠাৎ কেমন অসহায়-অসহায় লাগল। কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই নির্জন শাল-জঙ্গল, চাঁদের আলো। দু-একটা গোরুর গাড়ি আগে চোখে পড়লেও এখন আর মানুষ-জন গাড়ি কিছুই চোখে পড়ছে না। এ-পথে কি মানুষ চলে না?

বরদার কেমন ভয়-ভয় লাগল। সে কি ভাল করল এসে? এখানে কি তার মন টিঁকবে? কে জানে সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেন্টারে পৌঁছে সে কী দেখবে? অস্বাভাবিক কিছু মানুষ, না হয় কিছু পাগল। বড়জোর দেখবে এক-একজন এক-একরকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখায়। কী লাভ হবে তাতে?

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি।"

"আর কতটা?"

"আধ মাইল মতন।"

"কোন দিকে?"

সিদ্ধেশ্বর টিলাটা দেখালেন, বললেন, "ওর পেছন দিকে।"

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, "সিদ্ধেশ্বরবাবু, আপনি তো আমাকে নিয়ে এলেন, কিন্তু আমি যদি থাকতে না পারি?"

"কেন পারবেন না? পারবেন।"

"আমরা জলের মাছ, এই ডাঙায় কি ভাল লাগবে?" বলে বরদা হাসবার চেষ্টা করল। "মানিক থাকলে তবু হত।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। খাওয়া দাওয়া শোয়া—কোনো কষ্ট পাবেন না। আপনি আপনার মতন ঘুরে বেড়াবেন, আমাদের লোকজন দেখবেন। শুধু একটি-মাত্র কাজ আপনি করবেন না, অন্তত আমাকে না জানিয়ে—।"

"কী কাজ?"

"মহাদেবের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না। ওকে সব সময় এড়িয়ে যাবেন। যদি কখনো মনে হয় আমার, আমি আপনাকে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে বলে দেব। লোকটা ধুরন্ধর, ধূর্ত। ও আপনাকে দেখে কেমন চমকে যায়—আজই দেখবেন।"

বরদা বলল, "মহাদেবের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বেঘোরে আমি না মরি মশাই!"

সিদ্ধেশ্বর হাসলেন। "মরার কথা তুললেন বলেই বলছি। আমি বেঁচে থাকতে আপনি মরবেন না। আপনি আমার বন্ধু, আশ্রিত। আমি আমার স্বার্থে আপনাকে এনেছি, কাজ শেষ হলে আমি নিজে আপনাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসব।"

বরদা কোনো জবাব দিল না।

টাঙাটা যথারীতি ছুটছিল। অজস্র জোনাকি জ্বলছে এক-জোড়া গাছের তলায়। বুনো পাখি ডাকল কোথাও। ঠাণ্ডা লাগছিল বরদার।

আরও খানিকটা এগিয়ে এল টাঙা। সিদ্ধেশ্বর হাত তুলে দেখালেন। বললেন, "ওই দেখুন আমাদের জায়গা।"

তাকাল বরদা। খুব একটা কাছে নয় সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেন্টার। স্পষ্ট করে কিছু চোখে না পড়লেও একটা আভাস

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

সমুদ্র-স্রোত

সমুদ্রের জল কখনও স্থির থাকে না। সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখা যায়, ঢেউয়ের পর ঢেউ তীরে এসে আছড়ে-আছড়ে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু শুধু ঢেউই নয়, সমুদ্রের জলে আরেক রকমের গতি আছে, তাকে বলা হয় সমুদ্রস্রোত। এই সমুদ্রস্রোত দুরকমের হয়—শীতল ও উষ্ণ। স্থলভাগের ওপর দিয়ে যেমন নদী বয়ে যায়, জলের ওপর দিয়ে এই স্রোতও তেমন একটি নির্দিষ্ট পথে বয়ে যায় বছরের পর বছর। এই স্রোতের উৎপত্তির অনেক কারণ আছে। সাধারণত, বায়ুপ্রবাহকেই এর উৎপত্তির কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এবং বায়ু-প্রবাহের দিক অনুসারেই এই স্রোত প্রবাহিত হয়। এছাড়া আরও কারণ আছে—জলের উষ্ণতার তারতম্য, পৃথিবীর ঘূর্ণন। তাছাড়া মহাদেশগুলির আকৃতিও এই স্রোতের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণত তিনটি মহাসাগরেই স্রোতের আধিক্য দেখা যায়। আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহা-সাগর। ভারত মহাসাগরের সমুদ্রস্রোতের গতিপথ আবার ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তিত হতে থাকে। শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর জন্যে একরকম আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্যে আরেক রকম। প্রত্যেকটি সমুদ্রেই বিষুবরেখার কাছে উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দুটি করে স্রোত আছে। এগুলির সৃষ্টি হয়েছে আয়ন বায়ুর প্রবাহে। এদের মাঝখানে আবার একটি করে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত আছে। নিরক্ষ-রেখায় উৎপন্ন বলে এই স্রোতের জল সর্বদা গরম থাকে—সেই-জন্যে একে উষ্ণ স্রোত বলা হয়। বিষুব রেখা থেকে যে স্রোত-গুলি উত্তরে বা দক্ষিণে যায়, সেগুলির জল গরম। উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে যেগুলি বিষুব রেখার দিকে আসে, সেগুলি ঠান্ডা অর্থাৎ শীতল স্রোত। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখান দিয়ে উষ্ণ স্রোত ও শীতল স্রোত পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে বিপরীত গতিতে। এই সব জায়গায় ঝড় ঝঞ্ঝা, কুয়াশা লেগেই থাকে। যেমন, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলের নিউ ফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপ।

উষ্ণ স্রোতগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল, উত্তর আমে-রিকার পূর্ব উপকূলের মেক্সিকো উপসাগরের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত বা গালফ স্ট্রীম এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানের পূর্ব উপকূলের কুরো-শিয়ো স্রোত। এগুলি দেশের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে আবহাওয়াকে গরম রাখে, বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে। এমন কী গালফ স্ট্রীম যখন পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বেঁকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে যায় তখন এখানকার সমুদ্রে জল জমতে পারে না। সারা বছরই বন্দরে জাহাজ চলাচল করতে পারে, অথচ প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত উত্তর আমে-রিকার ল্যাব্রাডর ঠান্ডার জন্যে মানুষের বাস করার প্রায় অনুপ-যুক্ত এবং শীতকালে ল্যাব্রাডর স্রোতের প্রভাবে উত্তর-পূর্ব কানাডায় প্রচুর ঠান্ডা পড়ে।

পাওয়া যাচ্ছিল জায়গাটার। মনে হল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এক-তলা টানা কিছু বাড়িটাড়ি। ব্যারাক বাড়ির মতন দেখাচ্ছিল। টিমটিম আলোও চোখে পড়ছিল বরদার।

ধবধবে চাঁদের আলোয় একটা মফস্বলী হাসপাতাল কিংবা কোনো ছোট মিলিটারি ব্যারাক বাড়ি পড়ে থাকলে বোধহয় এই রকমই দেখায়।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বরদাবাবু, আপনার নামটা যদি কয়েক দিনের জন্যে পালটে নিতে চান তাও পারেন।"

বরদা বলল, "না, নাম আমি পালটাব না মশাই।"

হাসলেন সিদ্ধেশ্বর। "না পালটালেন। মহাদেব দাশের সঙ্গে মিলিয়ে একটা নাম দেওয়া যেত।"

"মহাদেবের বয়েস কত?"

"আপনার চেয়ে দু-এক বছরের বড়।"

"আমার সঙ্গে ওর চেহারার এমন মিল কেমন করে হল?"

"ও-রকম হয়। হামেশাই হয়। তবে খানিকটা অমিলও আছে।"

"কী?"

"মহাদেবের কান বড়; আপনার ছোট। মহাদেবের নাক আপনার চেয়েও বসা। তার কাঁধের দু পাশ উঁচু মতন। আরও আছে ছোটখাট; আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

টাঙাটা হঠাৎ ঝাঁকি মেরে উঠল। তার পরই দেখা গেল গাড়িটা প্রায় উলটে যাবার অবস্থা। ঘোড়াটা সামনের পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন।

টাঙাঅলা ঘোড়াকে বাগে আনল।

বরদা বলল। "আচ্ছা ঘোড়া তো! উলটে দিত মশাই।"

সিদ্ধেশ্বর হেসে ফেললেন। "ঘোড়ারা ওরকম করে।"

বরদা সাবধানে বসল।

আরও খানিকটা এগিয়ে আসার পর বরদা বাড়িটা পুরো-পুরি দেখতে পেল। ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড। কাঠের ফটক। পাঁচিল ঘেঁষে কিছু গাছপালা। বাড়ির মাথায় টালির ছাদ। জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছে টালির ছাদে।

ফটকের কাছাকাছি টাঙাটা পৌঁছতেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে ইলেকট্রিক আলো নেই। আপনার একটু অসুবিধে হবে।"

বরদা কোনো জবাব দিল না।

ফটকের সামনে এসে টাঙা দাঁড়াল।

সিদ্ধেশ্বর টাঙা থেকে নেমে ফটক খুললেন। বললেন, "দাঁড়ান, আমি লোক ডাকি, সুটকেসগুলো নামিয়ে নেবে।"

সিদ্ধেশ্বর সামান্য এগিয়ে কাকে যেন ডাকছিলেন।

বরদা নেমে দাঁড়াল। পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কোমর-টোমর ব্যথা করছিল।

আর খুবই আচমকা টাঙাটাকে ঘুরপাক খাইয়ে ঘোড়াটা আবার সামনের পা তুলে চেঁচাতে লাগল।

বরদা সরে এল একপাশে।

ঘোড়াটা কেন যে সামনের পা তুলে চেঁচাচ্ছে বরদা কিছু বোঝবার আগেই সিদ্ধেশ্বর যেন এক ছুটে ফিরে এলেন।

তারপর অবাক হয়ে বরদা দেখল সিদ্ধেশ্বর ঘোড়াটাকে বাগে আনবার জন্যে প্রায় যেন তার মুখের দড়িদড়া ধরে ঝুলে পড়েছেন।

টাঙাঅলাও ততক্ষণে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছে।

সিদ্ধেশ্বরই শেষপর্যন্ত জিতলেন।

কিন্তু ঘোড়ার খুরের ঠোক্কর খেয়ে তাঁর কপাল কেটে রক্ত পড়ছিল।

(ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

সন্তু কোথায়

প্রদীপচন্দ্র বসু

খেলার মাঠে সন্তুর সঙ্গে কথা হয়েছিল রাত্রে আম কুড়োতে যাব।

সন্তু আমার বাড়ির পাশেই থাকত। ঠিক এগারোটায় ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ও এসে হাজির হল। বাড়ির বাইরের দিকে পড়ার ঘরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। বাবা, দাদা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভেতর থেকে কারও গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম না। শুতে যাবার আগে মা দেখে গেছেন আমি পড়ছি। গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুললে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা। সেজন্য মা কয়েকদিন আগে পড়ার ঘরেই আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, পড়তে পড়তে ঘুম পেলে আমি যাতে ওখানেই শুতে পারি। আমি যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি। একলা শুতে আজকাল আর ভয় করে না।

সন্তু এসে ডাকতে আমি চুপিচুপি পড়ার ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আম কুড়োতে যাবার কথা বাড়ির কাউকে বলিনি। বললে এত রাত্রে কেউ আমাদের যেতে দিতেন না। ছোটবেলায় ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ার সময় বন্ধুরা মিলে প্রায় রোজই বিকেলবেলা আমবাগানে যেতাম। কুড়িয়ে পাওয়া আম খাবার লোভ উঁচু ক্লাসে ওঠার পর চলে গেছে। সেদিন খেলার মাঠে অনেকদিন পর পুরোনো ইচ্ছেটা কেন জানি হঠাৎ আমার আর সন্তর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল!

সেসময় আমরা মালদা জেলার মানিকচকে থাকতাম। মানিকচককে ঠিক শহর বলা যায় না। গঞ্জের মতো ছিল জায়গাটা। এমনিতেই মালদার আমের যথেষ্ট নামডাক আছে। মানিকচকের আমবাগান আবার জেলাবিখ্যাত। তবে আমাদের নিজস্ব কোনও আমবাগান ছিল না। ঠাকুর্দা মারা যাবার আগে ভিটেবাড়িটা ছাড়া আর সব জমিজমা বিক্রি করে ফেলেছিলেন পিসীদের বিয়ে দিতে। ধানচালের ব্যবসা করে বাবা সংসার চালাতেন। আমরা বাজার থেকে আম কিনে খেতাম। এছাড়া চুরি করে কুড়িয়ে খাওয়া-টাওয়া তো ছিলই।

বিকেলে অল্পস্বল্প ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় আকাশ পরিষ্কার ছিল। সন্তু আর আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি চারপাশে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। আমাদের বাড়ি থেকে আমবাগানগুলি বেশ খানিকটা দূরে। লোকালয় ছাড়িয়ে যেতে হবে। সেজন্য দুই বন্ধু মিলে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। বাড়ির লোকেরা টের পাবার আগেই ফিরে আসতে হবে।

নিস্তব্ধ রাত। পাতলা বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। দিনের গরমভাব এখন নেই। পরিষ্কার জ্যোৎস্নার আলোয় মেঠো রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে আমার ভালই লাগছিল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী রে বাবলা, ব্যাগ এনেছিস তো?"

"এনেছি। পকেটে আছে।" নিচু গলায় সন্তুকে বললাম আমি।

মিনিট দশেক হাঁটার পর পালেদের আমবাগানে আমরা প্রথম ঢুকলাম। বাগানটা খুব বড় না হলেও পুরনো। আমও ধরেছে অনেক। গাছের ওপর ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নায় আমগুলো ধুসর দেখাচ্ছিল। বেশ বড় বড় ফজলি আম ঝুলে আছে থোকায় থোকায়।

কিন্তু গাছতলায় খুঁজেপেতে একটা আমও পেলাম না দুজনে। আশ্চর্য ব্যাপার! বিকেলে ঝড় হল, অথচ একটা আমও

বাগানে পড়ে নেই। এর মধ্যে কারা যেন সব কুড়িয়ে নিয়েছে! এদিককার আমবাগানে পাহারাদার বা মালি রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢিল ছুঁড়ে বা চুরি করে কেউ আম খায় না। লোকে গাছতলায় কুড়িয়ে যা পায় তাই যথেষ্ট। কুড়িয়ে পাওয়া আম নিলে বাগানের মালিকও কিছু বলে না।

প্রথম বাগানে আম না পাওয়ায় আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। এরপর দুই বন্ধু ঢুকলাম পাশের বাগানে। বাগানটা এক মারোয়াড়ির। আমরা নাম জানতাম না। এই বাগানের গাছগুলি বেশ ঝাঁকড়া আর ঘন করে লাগানো। ফলে আগের বাগানের মত গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো বাগানে বিশেষ ঢুকছিল না। তাহলেও যা ঢুকছিল তাতে গাছতলার মাটি দেখতে পাচ্ছিলাম কোনোমতে। কিন্তু আমি আর সন্তু পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না ভাল করে।

এ বাগানেও যখন একটা আমও কুড়িয়ে পেলাম না, খুব হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। ঝড়ে পড়া আম সব কারা কুড়িয়ে নিল? সেই ছোটবেলা থেকে আম কুড়োচ্ছি, এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি কখনও। হঠাৎ খেয়াল করলাম, আম খুঁজতে খুঁজতে আমি আর সন্তু আলাদা আলাদা হয়ে গেছি। আধো-অন্ধকারে সন্তুকে ধারে-কাছে দেখা যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে টর্চ নেই। বাড়ি থেকে আনতে ভুলে গেছি।

সন্তুকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি বাগানের মধ্যে অস্থির ভাবে ঘুরতে শুরু করলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মধ্যে টুপটাপ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। ওগুলো পাতা ঝরার শব্দ। গাছ থেকে আম পড়লে ওরকম শব্দ হয় না। কারুর পায়ের শব্দও ওরকম নয়। তাহলে সন্তু গেল কোথায়? আম কুড়োনোর কথা আমার মাথায় উঠল। এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠল আমার হাত-পা।

একা-একা সেই অন্ধকার বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি ডাকতে লাগলাম, "সন্তু! এই সন্তু! তুই কোথায়?" কেউ সাড়া দিল না। তার বদলে একটা রাতজাগা পাখি মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে বিকট স্বরে ডেকে উঠল। আচমকা পাখির বিকট ডাক শুনে ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। গায়ের লোম সব খাড়া হয়ে গেছে। আমি এখন কী করব?

এমন সময় পাশ থেকে কে যেন খুব আস্তে আমার নাম ধরে ডাকল। গলার স্বর শুনেই বুঝলাম সন্তু. অথচ বুঝতে পারলাম না কখন ও পাশে এসে দাঁড়াল। চোখ খুলে ওর দিকে ঘুরে বললাম, "কী রে, তুই কোথায় চলে গিয়েছিলি?"

"আমি তোর পাশেই ছিলাম।" উত্তর দিল সন্তু।

"তাহলে আমি তোকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কেন?"

"অন্ধকারে ওরকম হয়।"

সন্তু আমার পাশে এসে দাঁড়ালেও ওর মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে ওকে কাছে পাওয়ায় আমার ভয়টা কমতে শুরু করল।

আমি বললাম "সন্তু, একটা আমও পাচ্ছি না আজ। কপাল খারাপ। চল বাড়ি ফিরে যাই।"

আমার কথায় গুরুত্ব দিল না সন্তু। বলল, "ফিরে যাব কী! তার চেয়ে বাবলা—চল আমরা গড়পারের আমবাগানে যাই। এদিককার বাগানের আম ধারে-কাছের লোকজন কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। অতদূরে কেউ আম কুড়োতে যায় না। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

সন্তুর কথা শুনে আমি একটু অবাক হলাম। ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি কি সব লোপ পেয়ে গেছে? গড়পারের আমবাগান এখান থেকে অন্তত মাইল দুয়েক দূর হবে। নদীর সরু বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে একটানা। দিনের বেলা হলে না হয় একটা কথা ছিল। এই নিশুতি রাতে ওখানে কেউ যায় বলে আমি শুনিনি। ধারে-কাছে মানুষের বাড়িঘর নেই।

বাগানের মধ্যে এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খানিক আগে পাখির চিৎকার শুনে আচমকা ভয় পাওয়ায় সেই ক্লান্তি এখন শরীরে জেঁকে বসেছে। রাত কত হয়েছে জানি না! একবার ভাবলাম গড়পারের আমবাগানে যাব না। ফিরতে দেরি হলে বাড়ির লোক জেনে যেতে পারে। তখন আম কুড়োনো বরাবরের জন্যে ঘুচে যাবে। আবার ভাবলাম, এত কষ্ট করার পরেও একটা আম নিয়ে বাড়ি ফিরব না? পকেটের ব্যাগ পকেটেই থেকে যাবে? সাতপাঁচ ভেবে শেষপর্যন্ত সন্তুর কথায় রাজী হয়ে গেলাম। ওকে বললাম, "সন্তু, গড়পারের বাগানে যেতে পারি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

"নিশ্চয়ই।" একটু মুচকি হেসে সম্মতি জানাল সন্তু। অন্ধকারে ওর মুখের হাসি দেখতে না পেলেও গলার স্বর শুনে তা বুঝলাম। আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি ভেবে বোধ হয় ওর এই হাসি।

নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে আমরা দুজনে হাঁটছি। হাঁটছি তো হাঁটছিই! বাঁধটা সরু থাকায় দুজনের পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব হচ্ছিল না। সেজন্য সন্তু আগে যাচ্ছিল, আমি পেছনে। তাড়া থাকায় সন্তু এবার এত জোরে হাঁটতে শুরু করেছে যে আমি কিছুতেই ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলাম না। পেছন থেকে মনে হচ্ছিল ও যেন উড়ে যাচ্ছে!

নদীর চড়া, জলের মৃদু স্রোত চারপাশের গাছপালা, পাটক্ষেত দূরের আমবাগান, সামনে সন্তু—জ্যোৎস্নার আলোয় চারপাশের সবকিছুই আবছা দেখালেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আমার মনে হল নদীর ধারে জ্যোৎস্না লোকালয় থেকে আরো বেশি উজ্জ্বল হয়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাঁধের পাশে

মাঝিদের কুঁড়েঘর পার হয়ে গেলাম। সন্তু আগে থাকায় আমাদের কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুজনেই চেষ্টা করছিলাম গড়পারের আমবাগানে কত তাড়াতাড়ি পেঁছানো যায়।

তাড়াতাড়ি করায় হাঁটতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই সরু বাঁধের ওপর পা ঠিকমত পড়ছিল না। হড়কে যাচ্ছিল। দু একবার হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে গেছি। বাঁধের ওপর আবার গরমের দিনে সাপের ভয় খুব। না দেখেশুনে একবার পা ফেললে আর নিস্তার নেই। অথচ সন্তুর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছিল ও এসবের কোনো পরোয়া করছে না।

কতক্ষণ এভাবে একটানা হেঁটেছি মনে পড়ছে না। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ছুটে এসে আমায় জাপটে ধরল! আমি ছটফট করে নিজেকে ছাড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমার ছটফটানি থামতে সে পেছন থেকেই আমার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মারল। চড় খেয়ে আমি নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি উদাস মিঞা আমাকে ধরে রেখেছে। উদাস মিঞা নৌকা চালায়। আমাদের খুব পরিচিত মাঝি ও। চোখাচোখি হতেই ও বাজখাই গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেউ কোথাও নেই, এই নিশুতি রাতে একা-একা তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? মরার সাধ হয়েছে তোমার?"

"মরতে যাব কেন? আমি আর সন্তু গড়ের বাগানে আম কুড়োতে যাচ্ছিলাম।" ধরা গলায় উদাস মিঞার জেরার উত্তর দিলাম আমি।

"কোথায় সন্তু? আমি তো কাউকেই দেখছি না তোমার সঙ্গে?" উদাসের গলার স্বর আবার কাঁপিয়ে তুলল রাত্রির নিস্তব্ধতাকে।

সামনের দিকে হাত দেখিয়ে আমি বললাম, "ওই তো! আগে হেঁটে যাচ্ছে।"

আমার আর উদাসের কথাবার্তা শুনে সন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হাত তুলে ওকে দেখাতেই ও পেছন ফিরে তাকাল।

এদিকে চড় খেয়ে উদাসের হাতের বাঁধনের মধ্যেই আমি তখন থরথর করে কাঁপছি।

সন্তু পেছন ফিরে তাকাতেই ওর মুখের চেহারা দেখে আমার বুকের রক্ত আরো হিম হয়ে গেল। ও কীরকম মুখের চেহারা সন্তুর? সন্তুর অত সুন্দর মুখটাকে এক নিমেষে কে এরকম হিংস্র করে দিল? গলার স্বরটাও বদলে ভয়ংকর হয়ে উঠল হঠাৎ। ওরকম গলার স্বর কোনো মানুষের হতে পারে না। এই সন্তুকে আমি চিনি না। এই সন্তুকে আমি দেখিনি কোনোদিন।

কিন্তু ও আমাকে চেনে। জিজ্ঞেস করল, "কী রে বাবলা? আম কুড়োতে আর যাবি না?"

উত্তর দেবার মত অবস্থায় আমি তখন নেই। উদাস মিঞার চড় খাবার পরেও শরীরে যা জোর ছিল, সন্তুর বীভৎস মুখ আর ভয়ংকর গলার স্বর শুনে তাও হারিয়ে গেছে। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। ঠোঁট দুটোতেও কোনো সাড় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমি কিছু বলছি না দেখে ও আবার বলল, "যা—! এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলি!"

কথা শেষ হতে না হতেই আমার চোখের সামনে সন্তুর চেহারাটা যেন ভোজবাজিতে হঠাৎ মিলিয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখি মায়ের বিছানায় শুয়ে আছি। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মা, বাবা, দাদা, উদাস মিঞা আর সবার সামনে সন্তু।

সন্তুকে সবার সঙ্গে দেখতে পেয়ে আমি কীরকম বোকা হয়ে গেলাম। ওর বীভৎস মুখের চেহারা ভয়ংকর গলার আওয়াজ আবার আমার মনে পড়ে গেল।

বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসে ভয়ার্ত গলায় বললাম, "সন্তু! তুই এখানে?"

সন্তু কিছু বলল না। আমার কথা শুনে বাবা এক পা সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "সন্তু বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল।" তারপর শান্তগলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কার সঙ্গে আম কুড়োতে যাচ্ছিলি বাবলা?"

কার সঙ্গে আবার? সন্তুর সঙ্গে। মনে মনে উত্তর দিলাম আমি।

কিন্তু বাবা বলছেন, সন্তু বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল। তাছাড়া উদাস মিঞাও আমার সঙ্গে সন্তুকে দেখতে পায়নি। তাহলে কে আমার সঙ্গে আম কুড়োতে গিয়েছিল? উদাস আমাকে ধরে না ফেললে সে আমাকে কোথায় নিয়ে যেত? কোন বাগানে আজ আম কুড়োতাম আমি?

অনেক চিন্তা করেও সেই মুহূর্তে আমি নিজের থেকে এর উত্তর খুঁজে পেলাম না।

ছবি সমীর সরকার

অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী

চিরঞ্জীব

এখনকার ভারত-অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সব্বার আগে আমার মনে পড়ে যায় ১৯৬৬-৬৭ মরসুমের কথা। গারফিলড সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সেবার ভারত সফর করছে। ছেষট্টির ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর একাদশ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলায় অমৃতসরের বারকি গ্রামের কুড়ি বছরের ছেলেটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আতঙ্ক ধরিয়ে দিল। বেদীর বলে ঘায়েল হলেন বাইনো, ডেভিস লয়েড, মারে, কিং ও সোবার্স (১০৯ রানে ৬ উইকেট), এবং তাঁর হাতে ধরা পড়েন হান্ট। টেস্ট ম্যাচ না হলেও বেদীর স্পিন বোলিং নিয়ে সোবার্সের দলের মধ্যে বেশ আলোচনা হল। বেদী সম্পর্কে ওঁরা বিস্তারিত খবর নিলেন। জানলেন—না, ও এখনও টেস্ট দলে আসেনি। ওঁদের ভয় হল, এই নীল পাগড়ির শিখ ছেলেটি ভারতীয় দলে নির্বাচিত হলে বেশ বেগ দেবে।

দিল্লিতে চারদিনের খেলা শেষ হল ২৩ ডিসেম্বর। কিন্তু তার আগেই ক্রি-কনট্রোল বোরড নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান এম দত্ত রায় একান্তে বেদীকে ডেকে বললেন: তুমি কলকাতায় যাওয়ার জন্য তৈরি হও। চেয়ারম্যানের মুখ থেকে শুনেও শুরুতে বেদীর বিশ্বাস হয়নি। পরদিন যখন সরকারীভাবে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ভারতীয় দলের নাম ঘোষিত হল, তখনই সে আশ্বস্ত হয়। মনে মনে সে ভয়ও কম পায়নি। জীবনের প্রথম টেস্ট, তাও কলকাতায় এবং সোবার্সের দলের বিরুদ্ধে। বেদী ভয় পাওয়ার কথা জানান চাঁদু বোড়ের কাছে। জানান কৃতজ্ঞতাও। কেননা, দিল্লির খেলায় ওই বোড়েই তাঁর হাতে বল তুলে দিয়ে সুযোগ করে দেন। বেদী সেদিন দলের সিনিয়রদের কাছে গিয়ে শুধিয়েছিলেন: পারব তো এই গুরু দায়িত্ব বইতে? বাপু নাদকার্নি বলেছিলেন: প্রথম টেস্টে এবং কলকাতায় যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলে যেতে পার, তোমার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবেই।

কলকাতা টেস্টের কথা অনেকেরই মনে আছে, কেননা খেলার দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ইডেনে অগ্নিকাণ্ড হয়। কিন্তু বিষেণ সিং বেদীর কাছে সেই খেলার স্মৃতি অত্যন্ত সুখের। এই নবাগত এবং চন্দ্রশেখর প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের রুখে দেন। বেসিল বুচার যখন প্রায় দাঁড়িয়ে গেছেন তখনই বেদীর বলের মেজাজ বুঝতে না পেরে ক্যাচ তুলে পতৌদির হাতে ধরা পড়লেন। এরপর তিনি আউট করেন ক্লাইভ লয়েডকে মাত্র ৫ রানের মাথায়। ১৯৬৬-৬৭ থেকে এবার অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে পর্যন্ত বেদী মোট ৫৩টি টেস্ট খেলেছেন। ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন চারটি সিরিজের ১৪টি টেস্টে। বলা বাহুল্য, এত খেলায় বেদী বিশ্বের তাবৎ ক্রিকেট অনুরাগীদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার মতো অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন স্বদেশে, নিউজিল্যাণ্ডে, অস্ট্রেলিয়ায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এবং ইংলণ্ডে। ১৪টি টেস্টে নেতৃত্বের মধ্যে সাফল্য এসেছে চারটিতে, ড্র চারটিতে। মোট ২১৫টি টেস্ট-উইকেট পেয়েছেন ৫৮৭৫ রানের বিনিময়ে। ১১টি ইনিংসে গড়ে পাঁচটির বেশি উইকেট পেয়েছেন। ন্যাটা স্পিনার বেদী ইংলণ্ডে নরদাম্পটনশায়ার কাউনটিতে গত দুয় বছরে ৫০০ উইকেট পেয়েছেন। তবে বেদীর কাছে এসবের চাইতে বোধহয় ইডেনের প্রথম টেস্টের 'সামান্য' সাফল্য অনেক গর্বের বিষয় হয়ে আছে।

বেদী আজও ভুলতে পারেন না ক্রিকেটের শুরু থেকে ১৫ বছর বয়সে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলা পর্যন্ত খালসা কলেজ ক্রিকেট দল এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক গুরুপাল সিং-এর সাহায্যের কথা। তবে ক্রিকেটের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে বেদী সবচেয়ে কৃতজ্ঞ অধ্যাপক গিয়ান প্রকাশের কাছে। তিনি দিনের পর দিন হাতেকলমে বেদীকে সব শেখান।

কলেজের বি-এস-বি (বিষেণ সিং বেদী) এখন দুই সন্তানের বাবা হয়ে নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্বশুরবাড়ির দেশ অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে ব্যস্ত। অস্ট্রেলিয়ায় হয়ত টমসন ও তাঁর সতীর্থরা আছেন; কিন্তু এখনকার বি-এস-বি-র (বেস্ট স্পিন বোলার) দল কি একেবারে দুর্বল?

Free !! Free !! Free !!

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগকরুনঃ

BHARAT AYURVEDASHRAM
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

চোখ-ধাঁধানো ব্যাডমিন্টন

মনোজ গুহ

মেয়েদের ডাবল্‌স ফাইনাল

গত কালীপুজো ও দেওয়ালীর সময় যখন আলোর ঝর্না-ধারায় কলকাতা মহানগরী স্নান করছিল তখন নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে চলছিল জোরালো আলোর মতোই চোখ-ধাঁধানো ব্যাডমিণ্টন খেলা। তিনটি দিন (৯—১১ নভেম্বর) প্রায় সাত-আট হাজার দর্শক উপভোগ করেছেন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা। এ-ধরনের আন্তর্জাতিক খেলা কলকাতায় এর আগে হয়নি। তাই দর্শকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা খুবই স্বাভাবিক। দীপান্বিতা উৎসবের মধ্যেও।

চারটি দেশের মোট ২০ জন পুরুষ ও ৯ জন মহিলা প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পুরুষ বিভাগে চীনের ৭ জন, জাপান ও থাইল্যাণ্ডের ২ জন করে, আর ভারতের ৯ জন ছিলেন। মহিলা বিভাগে ছিলেন ৯ জন সবাই ভারতের খেলোয়াড়। এই প্রতিযোগিতায় চীনের প্রাধান্যই প্রমাণিত হল। সিঙ্গলস ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন চীনের, আর ডাবলস-এর লড়াই হয়েছিল চীন ও জাপানের মধ্যে। থাইল্যাণ্ড ও ভারতের খেলোয়াড়রা তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেন নি।

খেলা দেখে বুঝলাম শারীরিক পটুতা না থাকলে আন্ত-র্জাতিক আসরে জয়ের মালা পরা যায় না। শারীরিক দক্ষতার কী অসাধারণ পরিচয়ই না দেখিয়ে গেলেন চীনের খেলোয়াড়রা! এবং জাপানের দুজনও। কোর্টের শেষ প্রান্ত থেকে নিমেষের মধ্যে নেটে এসে আবার শেষ প্রান্তে কীভাবে ফিরে যাওয়া যায় এবং কতখানি আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে পারা যায় তা তাঁরা আমাদের দেখিয়ে গেলেন। কী চমৎকার তাঁদের শরীরের নমনীয়তা! যেমন দ্রুত তাঁদের শরীর ঘোরান, তেমনি দেখার মত তাঁদের শরীরের মোচড়। অথচ সব কিছুই তাঁরা কী সাবলীল

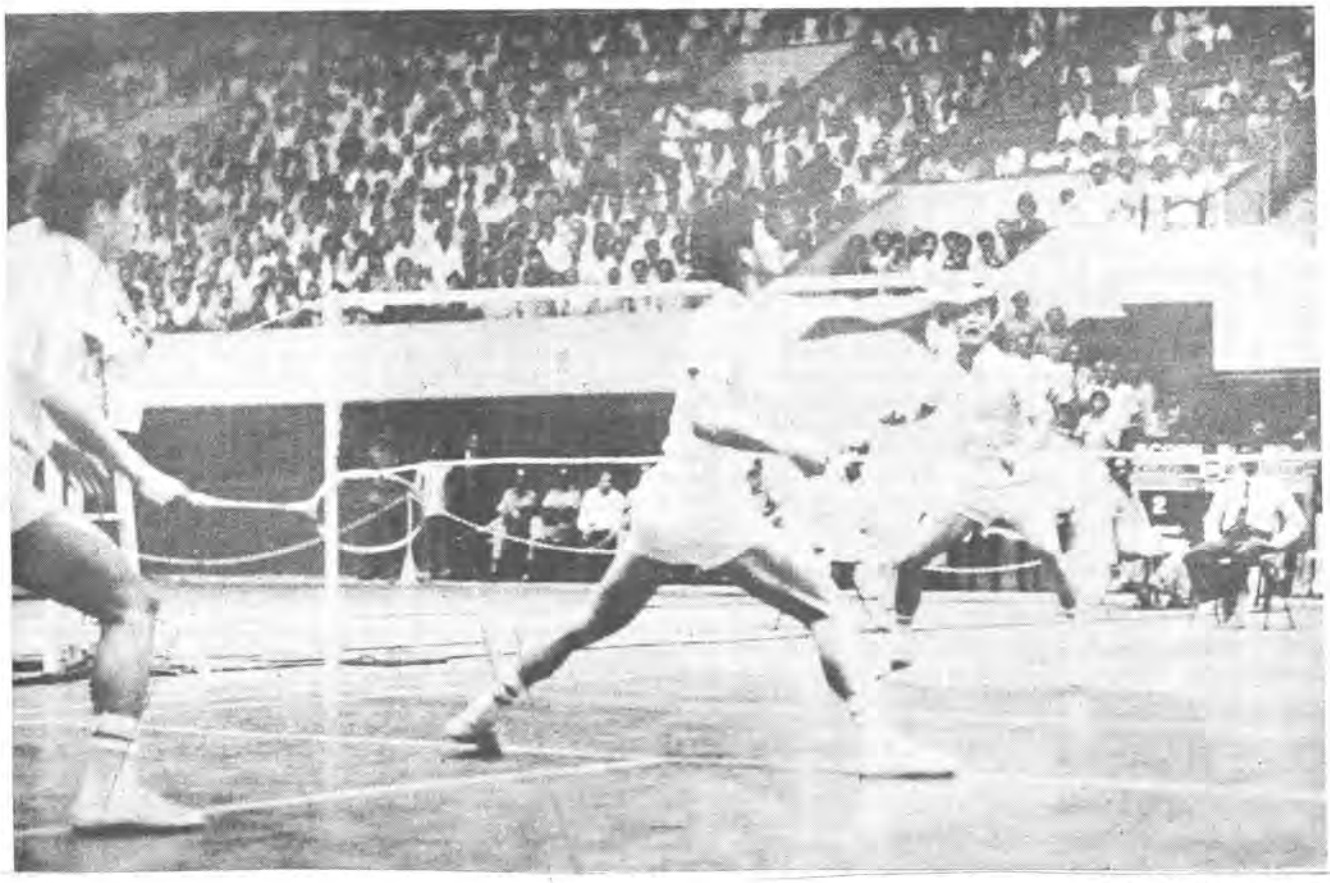

পুরুষদের ডাবলস্ ফাইনাল

ভঙ্গীতে করে গেলেন। আমরা দেখলাম এবং শিখলাম। শিখলাম, 'স্কিল' বা ক্রীড়াকৌশল যতই থাকুক না কেন, শরীর যদি চাবুকের মতো না হয় তাহলে শেষ রক্ষা করা যায় না। চীনের যে কজন খেলোয়াড় এবার ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লুয়ান চিন। পেশীতে আঘাত লাগার জন্যে তিনি কলকাতায় খেলেননি। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

এখন ফাইনাল খেলা নিয়ে দু-চার কথা বলি। সিঙ্গলস ফাইনালে মুখোমুখি হন চেন তিয়েন-লাং ও লিন ই-সিউং। চেন জয়ী হলেন ১৭—১৪ ১৭—১৬ পয়েন্টে। সতের বছরের লিন ছিলেন বয়সে চীন দলের সবচেয়ে ছোট। আমার ধারণা, দুই খেলোয়াড়ই এক দেশের হওয়াতে যথার্থ রেষারেষি হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুদেশের খেলোয়াড়ের মধ্যে হলে দেখা যায় জয়ের জন্যে জীবনপণ সংগ্রাম। যেমন দেখলাম ডাবলসের সেমিফাইনালে ও ফাইনালে।

ডাবলস-এর ফাইনালে জাপানের জিনিয়া ও মাসাও সুচিদা গোড়া থেকেই দ্রুত, আক্রমণাত্মক খেলা খেলে প্রথম গেমে চীনের জুটিকে ১৫—৪ পয়েন্টে হারিয়ে দেন। মাত্র সাত মিনিটে। দ্বিতীয় গেমে অবশ্য চীনারা কিছুটা বেগ দেবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাপান সে বাধা অতিক্রম করে ১৫-১০ পয়েন্টে গেমটি ও ট্রফি জিতে নেয়।

মহিলাদের বিভাগে সব খেলোয়াড়ই ভারতের হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ জমে ওঠেনি। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন অমি ঘিয়া অতি সহজেই দ্বিতীয় বাছাই লতা কৈলাসকে ১১-৩, ১১-৫এ হারিয়ে সিঙ্গলস খেতাব জেতেন। অমি পরে ডাবলসের খেলায় সুধা বাপনাকে সঙ্গী করে সুজাতা জৈন ও নরীন পাড়ুয়াকে সরাসরি ১৭-১৪ ও ১৫-৪ পয়েন্টে হারিয়ে দেন। অমি দ্বি-মুকুটের অধিকারিণী হলেন।

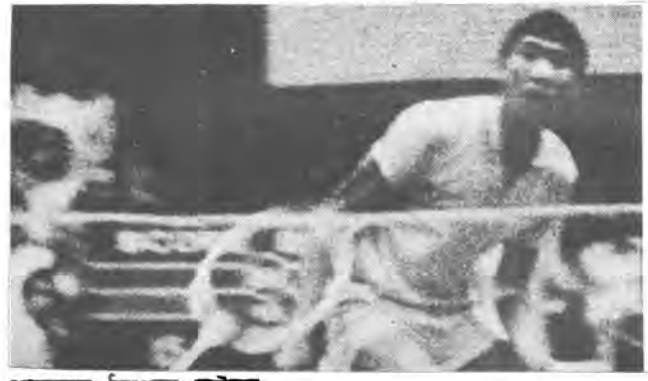

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল

প্রসঙ্গত বাংলার একটি ছোট মেয়ের কথা না বলে থাকতে পারছি না। সে হল শিলিগুড়ির মেয়ে মধুমিতা গোস্বামী। চোদ্দ বছরের মধুমিতা এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই এবং রানার্স-আপ লতা কৈলাস-কে রীতিমত বেগ দিয়ে তিন গেম খেলে হেরে যায়। তৃতীয় গেমে যদি মধুমিতার কয়েকটি সার্ভিস বাইরে না যেত তাহলে কী হত বলা যায় না। তবে লতা জিতেছে তার অভিজ্ঞতার জোরে। অক্টোবরে গৌহাটিতে জাতীয় জুনিয়র প্রতিযোগিতায় মধুমিতা গত বারের চ্যাম্পিয়ন মানিক কেলকার-কে হারিয়ে তার ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় রেখেছে। মধুমিতা এখন সাব-জুনিয়র গার্লস-এ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। মধুমিতার কাছ থেকে আমরা ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু আশা করি। অবশ্য, সামগ্রিকভাবে, আমাদের মহিলাদের খেলা দেখে কেউই বিশেষ আশা পোষণ করছেন না বলেই মনে হল।

ফোটো তপন দাশ

উঠতি দুই টেনিস তারকা

সুব্রত সরকার

জন ম্যাকেন্‌রো

ট্রেসি অস্টিন

জন ম্যাকেন্‌রো আর ট্রেসি অস্টিন : ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর মহলে যেসব নতুন নাম ফুটে উঠেছে তাদের মধ্যে আমেরিকার এই দুই টেনিস খেলোয়াড় অন্যতম। এই বছরটি নানা দিক থেকেই টেনিসের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জুনে ছিল উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের শতবার্ষিকী, জুলাইয়ে ইণ্টারন্যাশনাল লন টেনিস ফেডারেশন সরকারিভাবে তাদের নাম থেকে 'লন' শব্দটি বাতিল করে দিয়েছে। আর সেপ্টেম্বরে শেষবারের মতন বিখ্যাত ফরেস্ট হিলস প্রাঙ্গণে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল—আসছে বছর থেকে এই টুর্নামেণ্ট অন্য জায়গায় হবে। তবে তেমনভাবে দেখতে গেলে এই ঘটনাগুলি টেনিস-ইতিহাসে ঘটার কথাই ছিল, এগুলি দেখে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং ভবিষ্যতে টেনিস-প্রেমিকরা মনে রাখবেন, ১৯৭৭ সালেই ম্যাকেন্‌রো আর ট্রেসি অস্টিন তাঁদের নজরে পড়ে।

গত গ্রীষ্মে উইম্বলডন শতবার্ষিকীর সময় লণ্ডনে ছিলাম বলে আমিও আশা করছি, কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুই উঠতি টেনিস খেলোয়াড় যেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়। যদি হয় তাহলে অনায়াসে বলতে পারব : ওঃ, ম্যাকেন্‌রো (বা ট্রেসি অস্টিন)! হ্যাঁ, ও যেবার প্রথম উইম্বলডনে খেলেছিল তখন ওর খেলা দেখেছিলাম বটে। সত্যি কথা বলতে, এইবারের উইম্বলডন আরম্ভ হবার আগেই ট্রেসি অস্টিনকে নিয়ে ওখানকার কাগজে বিস্তর লেখালিখি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ, প্রতিযোগিতার একশো বছরের ইতিহাসে, বিংশ শতাব্দীতে তো বটেই, এক 'সিনিয়র' ইভেণ্টে সে হয়তো সর্বকালের কনিষ্ঠতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এবার উইম্বলডনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ট্রেসি। খেলার দিক থেকে ট্রেসি প্রথম রাউণ্ডে বাই পেয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে হারায় হল্যাণ্ডের খেলোয়াড়কে। তারপর সেণ্টার কোর্টে চ্যাম্পিয়ন ক্রিস এভার্টের সঙ্গে খেলা এবং পরাজয়। ট্রেসি বরং বিস্ময় সৃষ্টি করে ফরেস্ট হিলসে। এখানে সে বাছাই খেলোয়াড় ব্রিটেনের সুজান বার্কারকে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছয়।

জন ম্যাকেনরোর ব্যাপারটা ছিল অন্য ধরনের। একদিন আমি সেণ্টার কোর্টে ঢুকতে পারিনি বলে বাইরের একটা কোর্টে খেলা দেখছিলাম। স্যাণ্ডি মেয়ার বনাম ম্যাকেন্‌রো। মেয়ার দুই বছর আগে কলকাতা গ্রাঁ-প্রীতে নেমেও অসুস্থতার জন্য কোয়ার্টার-ফাইনালে ওয়াক-ওভার দেন। উইম্বলডনে দ্বিতীয় রাউণ্ডে বাছাই খেলোয়াড় ইতালির এড্রিয়ানো পানাত্তাকে সবে হারিয়েছেন। আর ম্যাকেন্‌রো কোয়ালিফায়ার হিসাবে চতুর্থ রাউণ্ডে উঠেছিল বলে সেদিনের কাগজে তার সামান্য উল্লেখ ছিল। ওই খেলায় ম্যাকেন্‌রো মেয়ারকে হারায়, আর পরের সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার ফিল ডেণ্টকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে পৌঁছে যায়! সেখানে অবশ্য জিমি কনার্স তাকে চার সেটে হারান—তবে সবার নজরে পড়বার মতন কৃতিত্ব অর্জন করেছিল ম্যাকেন্‌রো। ট্রেসি অস্টিন যেখানে আগাম প্রচার পেয়েছিল, ম্যাকেন্‌রো সেখানে তরতর করে সেমি-ফাইনালে উঠে সবাইকে আশ্চর্য করে দেয়। উইম্বলডন প্রতিযোগিতাটা এত বিরাট বড় যে প্রথম সপ্তাহে খবরের কাগজে যাকে-তাকে নিয়ে আলোচনা বেরনো সম্ভব নয়। শুধু প্রাথমিক পর্যায় থেকে উঠেছে বলে নয়, অত অল্প বয়সে কেউ কোনোদিন উইম্বলডন সেমি-ফাইনালিস্ট হয়নি।

ফরেস্ট হিলস টুর্নামেণ্টের সময় ম্যাকেন্‌রো উঠতি খেলোয়াড় বলে বেশ পরিচিত ছিল। সেখানে সে দুটি কারণে জনসাধারণের মনে থেকে যায়। প্রথমত সে বাছাই খেলোয়াড় ক্লে-কোর্ট বিশেষজ্ঞ এডি ডিব্‌সকে হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত ওঠে। দ্বিতীয়ত : গ্রাঁ-প্রী প্রতিযোগিতাগুলির জন্য এক সদ্য-প্রবর্তিত নিয়মে তাকেই সর্বপ্রথম শাস্তি দেওয়া হয়।

আজকাল টেনিস খেলোয়াড়েরা কোর্টে এত বেশি মেজাজ দেখান যে, আন্তর্জাতিক ফেডারেশন নিয়ম করেছে খেলার মধ্যে কেউ এরকম আচরণ করলে যে পয়েণ্ট খেলা হচ্ছে সেটা আম্পায়ার তক্ষুনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দিয়ে দেবেন। উইম্বলডনে জন ম্যাকেন্‌রো একধরনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল; যুক্তরাষ্ট্র ওপেন প্রতিযোগিতায় সে অন্য রকমের ঐতিহাসিক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।

ম্যাকেন্‌রোর মেজাজ যে খুব একটা শান্ত-প্রকৃতির নয় তা উইম্বলডনেই দেখা গিয়েছিল। তবে অনেক সমালোচকরাই মনে করেন, এই ধরনের কোর্টে রুক্ষতা এক ধরনের চ্যাম্পিয়নের লক্ষণ। এটা সত্যি, খেলার ভাব-ভঙ্গি আর মনোভাবে ম্যাকেন্‌রো অনেকটা কনার্স-এর ধরনের আর কনার্স ইলি নাস্তাসির মতন অতটা খারাপ ব্যবহার না করলেও তিনি অনেক দিক দিয়েই বেশ রুক্ষ প্রকৃতির।

ট্রেসি অস্টিন কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে একেবারে ম্যাকেন্‌রোর বিপরীত প্রকৃতির। ম্যাকেন্‌রো যেখানে ধৈর্যহীন এবং দুঃসাহসিক, ট্রেসি সেখানে দৃঢ় এবং মনোযোগী। উইম্বলডনের মতন অত বড় প্রতিযোগিতায় সব কিছু অচেনা-অজানা হলেও সে একবারও নার্ভাস হয়নি। খেলছিল জেন স্কুলের কোর্টে আন্তঃ-ক্লাস ম্যাচে। ক্রিস এভার্টের বিরুদ্ধে একটা ভাল স্ট্রোক করলে দর্শকরা তাকে যখন দারুণ হাততালি দিলেন, সে

দ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করল না।

ট্রেসির বাড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে পশ্চিমে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়াতে রোলিং হিলস শহরে। তার জন্ম ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে—অর্থাৎ যখন ফরেস্ট হিলসে সে মহিলাদের সিঙ্গলসের 'শেষ আট' স্তরে পৌঁছায়, তখনও তার ১৫ বছর পূর্ণ হতে তিন মাস বাকি। ট্রেসির বাবা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। বাড়িতে সবাই টেনিস খেলে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে যারা ছোট-বেলায় বিশেষ উৎসাহ দেখাত না তাদের ট্রেসির মা বলতেন, এক ঘণ্টা প্রাকটিস করলে পঁচিশ সেন্ট পাবে। ট্রেসির দিদি প্যাম ওয়ার্ল্ড টিম টেনিস খেলেছে; বড়দা জেফ জাতীয় র‍্যাঙ্কিং তালিকায় একাধিকবার নাম উঠিয়েছে। ট্রেসি অল্প বয়সে ববি রিগসের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে খেলে, আর আট বছর বয়স থেকে টুর্নামেন্ট জিততে শুরু করে। খেলে ডান হাতে, প্রধানত বেসলাইন থেকে। তবে তার গ্রাউন্ড-স্ট্রোকের দক্ষতা লক্ষণীয়। জুন মাসে তার উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি (এখন হয়ত আরেকটু লম্বা হয়েছে), দাঁত সোজা করবার জন্য সে পরে মেটালের ''ব্রেস'', চুলের স্টাইল আর খেলার পোশাকে একেবারেই কায়দা নেই। তবে কোর্টে নামলে তার অন্য চেহারা।

জন ম্যাকেনরো আবার আমেরিকার অন্য প্রান্তের। বাড়ি পূর্বাঞ্চলের নিউ ইয়র্ক স্টেটের ডগলাসটাউনে। ট্রেসি পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সব চাইতে ছোট, ম্যাকেনরো কিন্তু তিন ভাইয়ের মধ্যে সব চাইতে বড়। তার জন্ম অবশ্য পশ্চিম জার্মানিতে, ১৯৫৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। বাবা অ্যাটর্নি, ছোট ভাই প্যাট্রিকের বয়স মাত্র ১১ হলেও এরই মধ্যে তাকে কোচ হ্যারি হপম্যান দারুণ 'প্রমিসিং' মনে করেন।

BEEVAS/SB/771

ডোডো তাতাই

লেখা। তারাপদ রায়
রেখা। কৃত্তিবাস রায়

অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ। পুজোর ছুটি পার হতে না হতেই এবছর পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। দুরুদুরু বুকে ডোডোবাবু নরেন্দ্রপুরে ফিরে গিয়েছিলেন। তাতাই-বাবুও চোখ বুজে, দম বন্ধ করে পরীক্ষার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে—দুজনেই মোটা-মুটি সসম্মানে নদী পার হয়েছেন, অবশ্য গায়ে একটু কাদামাটি লেগে আছে। দু'জনেই বেশ ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত, ডোডোবাবু চোখদুটো আরও একটু ড্যাবডেবে করে ফিরে এসেছেন। আর, তাতাইবাবুর হাঁটুর কাছটা একটু লম্বাটে হয়ে গেছে।

এখন পড়াশোনা নেই, পরীক্ষা নেই, নতুন বই কেনা আরম্ভ হতে আরও মাসখানেক বাকি। ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনের হাতে এখন অঢেল সময়, অথচ কিছুই করার নেই। ফলে দুজনের মাথায় নানা গোলমেলে চিন্তা খেলা করছে।

ডোডোবাবু একটা ছবি এঁকেছেন, পাগড়ি মাথায় এক-জন সেপাই বসে আছে, তার পাশে একটা বড় তালপাতা। ছবিটি চমৎকার হয়েছে কিন্তু তার নীচে লিখে দিয়েছেন —'সেপাইয়ের তালপাতা'। ডোডোবাবুর বুদ্ধি দেখে তাতাইবাবু তাজ্জব। কিন্তু তাতাইবাবু এখন এইরকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে বিচলিত হতে রাজি নন। তাঁর মাথায় একটা জিনিস ঘুরছে, 'পাখিরা কখন দাঁড়ায়?'

গাছের ডালে, বারান্দায়, ছাদে যেখানেই যে পাখিকে দেখা যায় সবাই বসে আছে। তারা যখন হাঁটে তখনো বসেই হাঁটে, কখনো দাঁড়ায় না। নাকি, তারা সবসময় দাঁড়িয়েই থাকে, কখনো বসে না। মানুষ, জীব-জন্তু, কুকুর-বিড়াল, বাঘ-সিংহ সকলেই দাঁড়াতে পারে, বসতে পারে। কিন্তু পাখিরা পারে না, হয় তারা দাঁড়িয়ে থাকে, না হয় তারা বসে থাকে। আসলে তাদের বসা আর দাঁড়ানো সমান।

ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দু'জনেই এখন সব কাজ ফেলে পাখির চিন্তায় নিমগ্ন। পাখিরা কখন দাঁড়ায়, সত্যিই কি পাখিরা দাঁড়ায়, দাঁড়াতে পারে?

স্রোতের বিরুদ্ধে সহদেব

বজ্রসেন

সত্য অনেক সময়েই রূঢ়। নির্মম। প্রথমটা তাকে আমরা সহ্য করতে পারি না, কিন্তু কালের গুণে তা সয়ে যায়। বোধ হয় সেইজন্যেই বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতার দুবারের বিজয়ী সহদেব দাশের চার টাকা তেত্রিশ পয়সা রোজে সাহাগঞ্জের রবার ফ্যাক্টরিতে অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ করাটা আজ আর কাউকে বিচলিত করে না তেমন। সেখানেও আবার 'নো ওয়ার্ক নো পে।' অথচ শুনি, ফুটবল-ক্রিকেটের বড় বড় খেলোয়াড়রা তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কত সুবিধাই না পান। সহদেব অ্যাপ্রেন্টিসের কাজটা পেয়েছে ক্রীড়ানুরাগী প্রতিবেশী শ্রীনির্মলকুমার সেন মহাশয়ের চেষ্টায়। চাকরি নিয়ে সহদেবের বিশেষ ক্ষোভ নেই। শুধু যদি পুরোপুরি চাকরি আর অনুশীলনের সুযোগটা পাওয়া যেত! ক্ষোভের কারণ অন্যত্র।

সে কথায় আসার আগে মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সাঁতার প্রতিযোগিতাটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ১৯৬১ সালে গঙ্গার বুকে ৭৪·৪৮ কি· মি· দূরত্বের (৪৫ মাইল) এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মধ্যে দু' বছর (১৯৬৮ ও ১৯৭১) বাদে প্রত্যেক বছরই দুরপাল্লার প্রতি-যোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে। জঙ্গীপুরের রঘুনাথগঞ্জ সদর ঘাটে শুরু হয়ে বহরমপুরের গোরাবাজার ঘাটে শেষ হয়। বিজয়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয় সুদৃশ্য সুধাংশুশেখর বাগচি মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশিবার বিজয়ী হয়েছেন বৈদ্যনাথ নাথ—তিনবার (১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯)। দুবার বিজয়ী হয়েছেন সহদেব ছাড়া দেবী দত্ত (১৯৬৪, ১৯৬৫) আর বাংলাদেশের সাঁতারু রওশন আলি মণ্ডল (১৯৭২, ১৯৭৩)। বৈদ্যনাথ নাথের কৃতিত্ব এই যে, এই প্রতিযোগিতায় তিনি হ্যাট্ট্রিক করেছেন। কিন্তু তাঁর টাইমিংয়ের রেকর্ডটি ভেঙে দেয় সহদেব। প্রথমবার (১৯৭৫) অংশগ্রহণ করেই সহদেব ৯ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ৭·৫ সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে, যেটা বৈদ্যনাথ নাথের সময়ের থেকে প্রায় দুমিনিট কম। এ তথ্য পেয়েছি মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত স্মারকপুস্তিকা থেকে। পরের বার দ্বিতীয় হলেও এবার সহদেব আবার হারানো সম্মান উদ্ধার করেছে। তবে এবার ওর সময় খুব খারাপ হয়েছে। ১০ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৭·৭ সেকেণ্ড। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলল, এবার সকাল থেকেই প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল। আর ছিল প্রচণ্ড ঢেউ। যার ফলে সমস্ত প্রতিযোগীরই খুব অসুবিধা হয়েছে।

অবশ্য ঢেউকে সহদেব কোনওদিনই ভয় করেনি। চুঁচুড়ার মোগলটুলির এই ছেলেটির গঙ্গার সঙ্গে পরিচয় সেই ছেলেবেলা থেকেই। জোড়াঘাটে স্নান করতে গিয়ে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা 'এপার-ওপার' করছে দশ এগারো বছর বয়েস থেকে। স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটাটা ছিল ওর নেশা। ওতে দম, কলাকৌশল ইত্যাদি আয়ত্ত হত।

গঙ্গার প্রতিকূল স্রোত কী আর এমন। আরও অনেক প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধেই সহদেবকে লড়তে হয়েছে। এখনও হচ্ছে। বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে এক নম্বর হল দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের জন্যে সহদেবের লেখাপড়া কবে বন্ধ হয়ে গেছে। না হলে তো এতদিন ওর বাংলায় অনার্স নিয়ে পাশ করার কথা। ন'জনের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করা সোজা কথা নয়। সূর্যকুমার দাশ শক্ত সমর্থ অবস্থাতেই তা পারতেন না। গোটা সংসারটির ভরসা এখন সহদেবের দাদা মহাদেবের সামান্য একটি কাজ এবং দিদি রেণুকার আজ-আছে কাল-নেই 'চাকরি' এবং দু একটি প্রাইভেট টিউশন। সহদেব যা পায় তার থেকে খাবেই বা কী আর সংসারকে দেবেই বা কী? অথচ খাদ্য তো ওর চাই। মুর্শিদাবাদের প্রতিযোগিতার জন্যে যখন ও তৈরি হয় তখন ও দিনে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার কাটে। কিন্তু এই অনুশীলনের পর উপযুক্ত খাদ্য পায় না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেব এবার ওর শরীর বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, মনের জোরে এবং তার জীবনের আদর্শ পুরুষ নেতাজীর কথা স্মরণ রেখে সহদেব সফল হয়েছে। ও মনে করে অনুশীলনের পর ঠিক খাবার পেলে এবার সময় এতটা খারাপ হত না।

"তুমি এত বড় প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার কথা হঠাৎ ভাবলে কী করে?" জিজ্ঞাসা করলাম সহদেবকে।

রানাঘাটের চুর্নী নদীতে তিন মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় আর হুগলীর জুবিলী ব্রিজ থেকে জোড়াঘাট (এক মাইল) পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় তিনবার জয়ী হয়ে সহদেব উৎসাহিত হয়েছিল। এই উৎসাহ যাতে স্তিমিত না হয় তার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন অনিল রায়, অরুণ চৌধুরী নীলমণি মল্লিক ও তপন দে। এঁরাই সহদেবকে সবকিছু শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন বিপদে ধৈর্য ধরতে। ওঁদের আগ্রহাতিশয্যেই সহদেব ১৯৭৫ সালে মুর্শিদাবাদে অংশগ্রহণ করে।

"ভয় করেনি?"

"ভাবলাম একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। সেইভাবেই নিয়েছি। অবশ্য সেই সময় বিদ্রূপ করার লোকেরও অভাব হয়নি। মুর্শিদাবাদেরই এক প্রাক্তন বিজয়ী আমাকে বলেছিলেন, তুই নামবি মুর্শিদাবাদ কম্পিটিশনে? যাসনি, তোর টি বি ধরে যাবে!"

তা সহদেবের চেহারাটা রোগা-ই। ওজন বিয়াল্লিশ কিলো।

অবশ্য চেহারার জন্যে ওর কোনও অসুবিধা হয়নি বলেই সহদেব মনে করে। চুঁচুড়ার সুভাষ সরোবরে সহদেবের নিয়মিত অনুশীলন চলে। "রোজ দু' ঘণ্টা লং আর এক-আধ ঘণ্টা স্প্রিন্ট টানি।" ও নিজে একটি সুইমিং ক্লাব গড়ে তুলেছে। 'অগ্রণী'। জনাপঞ্চাশ ছেলে সেখানে সাঁতার শেখে। হুগলী জেলা সন্তরণ সংস্থার প্রতিযোগিতায় 'অগ্রণী' এবার রানার্স আপ হয়েছে।

জেলা সন্তরণ সংস্থার কথায় সহদেবের ক্ষোভের কথাটা মনে পড়ল। সহদেব যে সুভাষ সরোবরে অনুশীলন করে তার সংলগ্ন হুগলী জেলা বিদ্যালয় সাঁতার সংস্থার একটি তাঁবু আছে। একজন সাঁতারু হয়েও অনুশীলনের সময় সহদেব ঐ তাঁবুটি ব্যবহারের সুযোগ পায়নি। ফলে যেখানে সেখানে পোশাক রেখেই ওকে জলে নামতে হত এবং চোর ওর এই অসুবিধার সুযোগ নিতে ছাড়েনি।

আর একটি ব্যাপারে সহদেব আক্ষেপ করে। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বা ঐ মানের কোনও রেকর্ড বইতে মুর্শিদাবাদ সাঁতার প্রতিযোগিতার কোনও উল্লেখ থাকে না কেন? অথচ সকলেই জানে এটাই পৃথিবীর দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা।

মুর্শিদাবাদে বিজয়ী হয়েই কি সহদেব সন্তুষ্ট? অবশ্যই নয়। ও চায় ইংলিশ চ্যানেল আর পক্ প্রণালী অতিক্রম করতে। তারপর অন্য অভিযানেও অংশ নেবে।

"কিন্তু তার সঙ্গতি তোমার কোথায়?"

ম্লান মুখে ও উত্তর দিল, "ঠিক কথাই বলেছেন। ও-সব আমার বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মতো। আচ্ছা, এ-ব্যাপারে কেউ কি আমায় কোনওরকম সাহায্য করতে পারেন না? আমাদের সরকার?"

উত্তর দিতে পারিনি। কারণ ও-সব প্রশ্নের উত্তর আমারই জানা নেই।

শুধুমাত্র পাশ করতে নয়,
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশী নম্বর তুলতে
অদ্বিতীয় অভিনব এক বই!
AN ANALYTICAL APPROACH TO
EXHAUSTIVE
QUESTIONS
FOR
NINETEEN SEVENTYEIGHT & NINETEEN SEVENTYNINE
Price : Rs. 15/- only
এ বই কিনলে TEST PAPER
কেনার আর দরকার হয় না
B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE, CALCUTTA-9
Phone : 34-7328

ক্ষীর

মনোজিৎ বসু

কান্দাহারের বান্দা ছিল
ইস্কান্দার মির্জা।
ইস্পাহানী গোরুর দুধে
সে বানাত ক্ষীর যা—
তেমন ক্ষীরের স্বাদটি কভু,
পাননি আলিবর্দি.
কেমন ক'রে পাবেন বলো,—
তাঁর যে খালি সর্দি।
কিন্তু সে-ক্ষীর খেয়ে ক্লাইভ
হয়ে ভীষণ চাঙ্গা
পলাশিতে দৌড়ে গিয়ে
লাগিয়ে দিলেন দাঙ্গা!

দাঙ্গা জিতে ক্ষীরের হাঁড়ি
নিয়ে গেলেন গির্জায়—
একটুখানি ক্ষীরের লোভে
পিছন পিছন ভিড় যায়।
তেমন ভিড়ও হয়নি পরে
অখণ্ড সেই বঙ্গে—
মীরজাফরও ক্ষীরের চাঁছি
খেয়েছিলেন রঙ্গে!

সে-ক্ষীর এখন বানায় শুনি
মানিকলাল খাস্তগীর,—
তার কাছে যা, গাইবাঁধাতে
খানিক লাল চাস তো ক্ষীর!

ছবি সুনীল শীল

হালুম হুলুম

সুনীল জানা

এক বাঘের দুই বাচ্চা। একজনের নাম হালুম আর একজনের নাম হুলুম। হালুম পাঁচ মিনিটের বড়, আর হুলুম ঠিক সাত মিনিটের ছোট। হিসেবে কোন ভুল নেই। সিঙ্গিমামা নিজেই ওদের জন্মের সময়টা হিসেব করে দিয়েছে। সিঙ্গিমামা একবার ঘড়িপরা একটা আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলেছিল কিনা, সেই থেকে সে ঠিক-ঠিক সময় বলে দিতে পারে।

পাঁচ-সাত মিনিটের ছোট বড় হলে কী হবে, দুজনের মধ্যে ভারি ভাব কিন্তু! হালুমের হাঁচি পেলে হুলুমেরও তক্‌খুনি হাঁচি পায়। হুলুমের পেট কামড়ালে হালুমেরও অমনি পেট কামড়াতে থাকে। হালুম মনের আনন্দে গান গায় তো হুলুম ফুর্তির চোটে নাচ জুড়ে দেয়। আর খিদে পাবার বেলায়? তখন তো কোন কথাই নেই। দু'ভাই মিলে খাই-খাই করতেই আছে সব সময়। হালুম বলে, কী খাই—কী খাই? তো হুলুম বলে, হাতিঘোড়া যা পাই। ওদের খাওয়াতে-খাওয়াতে বাঘ শেষকালে ফতুর হয়ে গিয়ে ওদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।

হালুম হুলুম মহা-আনন্দে মামার বাড়ি এসে হাজির।

মামার বাড়ি ঢুকতে-না ঢুকতেই হালুম চেঁচাতে লাগল, "ও মামা গো, খুব খিদে পেয়েছে।" হুলুমও সমানে চেঁচাতে লাগল, "ও মামী গো, আগে খেতে দাও।"

সিঙ্গিমামা-সিঙ্গিমামী তো ভাগনেদের দেখে খুব আদর-টাদর করল, পেট ভরে কত কী খেতে দিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আরামে গল্পগুজব করতে লাগল। ওমা—গল্প করতে-করতে একটু বাদেই আবার খিদে পেয়ে গেল হালুমের। দেখতে-দেখতে হুলুমেরও।

হালুম বলে, "আবার যে একটু-একটু খিদে পাচ্ছে, মামা।"

হুলুম বলে, "আবার যে জোর খিদে পাচ্ছে, মামী।"

বাস, গল্প করা অমনি মাথায় উঠল, সিঙ্গিমামা বনে দৌড়ল শিকার ধরতে। বাড়িতে আর কিচ্ছুটি নেই। সিঙ্গিমামী একথা-সেকথা বলে ততক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করল ওদের। কিন্তু অত সহজে ভোলার পাত্র নয় ওরা। মিনিটে-মিনিটে ওরা চেঁচাতে লাগল, ও মামী গো—মামা কোথায় গেল? ও মামী গো, খিদের চোটে যে মরে গেলাম।

শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল সিঙ্গিমামীর। ভাগনেদের খিদের বায়না মেটাতে-মেটাতে দু দিনেই মামা-মামীর অবস্থা কাহিল। সিঙ্গিমামী একদিন চুপিচুপি সিঙ্গিমামাকে বলল, "চলো, এ-বন ছেড়ে পালাই। নইলে আমাদেরও খেয়ে সাবাড় করবে।"

সিঙ্গিমামা বলল, "ঘাবড়াও কেন? ওদের আমি ঠান্ডা করছি। ওরাও যেমন ভাগনে, আমিও তেমনি মামা।"

তারপর সিঙ্গিমামা ভাগনেদের ডেকে বললে, "ওরে হালুম, ওরে হুলুম, তোদের নিন্দের চোটে বনে আর কান পাতা যায় না যে রে।"

হালুম বলল, "কেন, মামা?"

হুলুম বলল, "কী হয়েছে, মামা?"

সিঙ্গিমামা কেশে-টেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "বাঘের বাচ্চা তোরা, দেখতে-দেখতে এই অ্যাতো বড়টা হলি, অথচ আজ অব্দি একটা মানুষ মারতে পারলি না? লজ্জায় কাউকে যে আর মুখ দেখাতে পারছি না। মানুষ না মারলে যে তোদের অন্নপ্রাশনই হবে না।

ওহ্, এই কথা! হালুম হুলুম অমনি লাফিয়ে উঠল, "ঠিক আছে, মামা। বাঘের বাচ্চা কাকে বলে, আজ দেখিয়ে দেব সবাইকে, মানুষ মেরে আজ অন্নপ্রাশন করবই করব।"

এই না বলে লেজ পাকিয়ে থাবা বাগিয়ে হালুম হুলুম মানুষ শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু মানুষ কাকে

বলে? সে আবার কোন ধরনের জানোয়ার? জন্ম থেকে একটাও যে মানুষ দেখেনি তারা।

হালুম জিজ্ঞেস করল. "মানুষগুলো কী রকম দেখতে. মামা?"

সিঙ্গিমামা মুখ বেঁকিয়ে বললে, "ভারি বিচ্ছিরি দেখতে মানুষগুলো। কেমন লম্বা লম্বা লিকলিকে চেহারা, গায়ে একটুও লোম নেই, পেছনের পা দুটো টেনে-টেনে হাঁটে, আর সামনের পা দুটো সঙের মত দুপাশে ঝুলিয়ে রাখে। দেখলে তোদের ভক্তি হবে না। কিন্তু খেতে যা চমৎকার—কী বলব! একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়তেই ইচ্ছে করে না। ওহ—সেই যে কবে একবার মানুষ খেয়েছিলাম—"

বলতে বলতে সিঙ্গিমামা বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল। তাই দেখে লোভের চোটে হালুম হুলুমের জিভ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে আর কী!

হুলুম জিজ্ঞেস করল, "মানুষগুলো কোথায় পাওয়া যায় মামা?"

সিঙ্গিমামা বললে, "এই বন পেরিয়ে সোজা চলে যা, যেদিকে দুচোখ যায়। ঝাঁকে-ঝাঁকে মানুষ দেখতে পাবি। কিন্তু খুব সাবধানে যাস বাপু। ভারি হিংসুটে হয় মানুষগুলো।"

হালুম হুলুম লেজ ফুলিয়ে বলে উঠল, "বাঘের বাচ্চা আমরা। মানুষ তো আমাদের কাছে নস্যি!"

এই না বলে আনন্দে লাফাতে-লাফাতে হালুম হুলুম চলল মানুষ শিকার করতে। কী ফুর্তি তখন দুজনের। ফুর্তির চোটে খিদে পাওয়ার কথা কারুর মনেই ছিল না। লাফাতে-লাফাতে একসময় তারা বনের একেবারে শেষ মাথায় এসে পৌঁছোল।

হালুম বলল, "এবার আমি ডানদিকে যাই।"

হুলুম বলল, "এবার আমি বাঁদিকে যাই।"

তখন হালুম চলল ডানদিকে। হুলুম চলল বাঁদিকে। আলাদা-আলাদা শিকার ধরবে দুজনে।

হালুম বেচারা তারপর ডানদিকে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যাওয়ার আর শেষ নেই। যেতে যেতে অনেক মাঠঘাট পেরিয়ে বনবাদাড় পেরিয়ে সকাল দুপুর সন্ধে পেরিয়ে শেষকালে এক গ্রামে এসে পৌঁছল। তখন একেবারে মাঝরাত্তির। সবাই তখন দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে যে যার বাড়িতে। হালুম আর মানুষ পাবে কোথায়। খিদের চোটে এদিকে বেচারার পেট চুঁই চুঁই করছে। মানুষ খুঁজতে-খুঁজতে হালুম এক সময় এক গেরস্থের বেগুন-খেতের কাছে এসে হাজির।

এদিকে গেরস্থ করেছিল কী, কাক তাড়ানোর জন্যে একটা কাকতাড়ুয়ার মূর্তি বানিয়ে বসিয়ে রেখেছিল বেগুন-খেতের মধ্যে। খড় দিয়ে বাঁধা লম্বা লম্বা হাত-পায়ের উপর একটা ঢোলা জামা পরানো, মাথার দিকে একটা কালো হাঁড়ি উপুড় করে চুন দিয়ে তার উপর চোখমুখ আঁকা। অবিকল মানুষের মত। তাই দেখে হালুম তো আহ্লাদে আটখানা। এতক্ষণে একটা মানুষ পাওয়া গেছে। মামার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। খিদের মুখে গোটা মানুষটাকে চিবিয়ে এক্খুনি অন্নপ্রাশন করে ফেলবে সে।

এই না ভেবে পেছন থেকে গুটিসুটি মেরে এগোতে এগোতে হালুম করল কী, লেজ বাঁকিয়ে থাবা বাগিয়ে সোজা মারল এক তিড়িং লাফ। ক্যাঁক করে কামড়ে ধরল মানুষটার এক পায়ে। ইসস্—ওয়াক্-থু-থু! কী সব গজগজ করছে তার মুখের মধ্যে! তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে থুথু ফেলতে লাগল হালুম। মুখটা তার বিচ্ছিরি বিস্বাদ হয়ে গেছে একেবারে। রেগেমেগে মেজাজ খারাপ করে হালুম তখন আর-একটা পা কামড়ে ধরল। ওমা—সেই একই রকম যে, কোন রসকস কিচ্ছুটি নেই। দুর্-দুর্, এমন অখাদ্য হয় নাকি মানুষগুলো? কিন্তু সিঙ্গিমামা যে বলেছিল এত করে? ভেবেচিন্তে হালুম তখন মাথা লক্ষ্য করে মারল আর এক চিড়িং লাফ। অমনি হল কী, হালুমের মাথার জোর ধাক্কা লেগে কাকতাড়ুয়ার মাথার কালো হাঁড়িটা ফটাস করে ফেটে ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

ব্যস্, আর যায় কোথা! মানুষ খাওয়া তো হালুমের মাথায় উঠল। কোত্থেকে কিসে যে কী হয়ে গেল, কে জানে। কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। বিলকুল ঘাবড়ে গিয়ে হালুম তক্খুনি এক লাফে পগার পার। ভয়ের চোটে চোঁচা কোন্দিকে যে দৌড় মারল, তার ঠিকঠিকানা নেই।

এদিকে হুলুমও বাঁদিকে যেতে যেতে এদিক পেরিয়ে ওদিক পেরিয়ে সেদিক পেরিয়ে মাঝরাত্তিরে এক শহরের কাছে এসে হাজির। যেখানে এসে পৌঁছল, সেখানে এক বড়লোকের বিরাট বাগানবাড়ি। হুলুম অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল। এ আবার কোথায় এলাম রে বাবা! যা হোক বাড়ির চারপাশের বাগানে অনেক গাছপালা দেখে হালুম তো সাহস করে ঢুকল ভেতরে। ঢুকে গাছের আড়ালে আবডালে এদিক ওদিক ঘুরঘুর করতে লাগল। এখন তাড়াতাড়ি একটা মানুষ যোগাড় করা দরকার। কোথায় যে থাকে হতচ্ছাড়া মানুষগুলো! খিদের চোটে এদিকে যে পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে সব।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় হুলুমের চোখ আটকে গেল। ঐ তো একটা মানুষ না? হ্যাঁ, ঠিক—মামার বর্ণনার সঙ্গে কাঁটায়-কাঁটায় মিলে যাচ্ছে একেবারে। ঐ যে ওখানে লম্বা মতন একটা দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ অমনি হুলুমকে আর পায় কে! খিদের জ্বালায় হুলুমের আর তর সইল না। মানুষটাকে যেই না দেখা, সঙ্গে-সঙ্গে পাগলের মত ছুটে গেল হুলুম। গিয়ে একটা মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিল মানুষটার পায়ে।

আর দেখতে হল না! বাগানের সেই মানুষটা তো আসলে মানুষ নয়, পাথরের পরীর মূর্তি একটা। কিন্তু হুলুম অত-শত বুঝবে কী করে? খিদের মুখে যেই না হুলুম কামড় মেরেছে তার পায়ে, অমনি তার কচি-কচি দাঁতগুলো একেবারে মট মট মটাস—আর কী! আর ভাঙা দাঁত দিয়ে গলগল করে সে কী রক্ত! বাবা রে—মামা রে—হালুম রে—গেলুম রে—বলতে বলতে হুলুমের তো মূর্ছা যাবার যোগাড়। কিন্তু মূর্ছা গেলে চলবে কেন? কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে তো। দাঁতের যন্ত্রণা ভুলে হুলুম তখন আর পালাবার পথ পায় না।

পরের দিন ভোরবেলা হালুম হুলুমের আবার দেখা হল সেই বনের ধারে। কিন্তু কেউ কাউকে তখন আর চিনতেই পারে না। কাকতাড়ুয়ার হাঁড়ি ভেঙে ভুষোকালি লেগেছে হালুমের মুখ জুড়ে। আর হালুমের সারা মুখ তো রক্তে মাখামাখি। বাঘের বাচ্চা বলে আর তাদের চেনার জো নেই।

দুজনেই অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে।

হালুম বললে, "তুই কে রে?"

হুলুমও বললে, "তুই কে রে?"

হালুম বলে, "আমি হালুম।"

হুলুমও বলে, "আমি হুলুম।"

তারপর দুজনের গলা জড়াজড়ি করে সে কী কান্না! কাঁদতে কাঁদতে হালুম হুলুম যে সেখান থেকে কোথায় চলে গেল, কে জানে। তবে সিঙ্গিমামার বাড়িতে আর তারা ফিরে যায়নি।

ছবি শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকারের ভেতর পদ্মফুলকে নিজের মত করে পেয়েছ? শীত পড়ে গেছে বেশ। সারা প্রকৃতি সেজে উঠেছে নানা রংয়ের মরসুমি ফুলে। তাদের ধরে রাখার সহজ নমুনা দিলুম। শুধু আঁকার আগে ফুলের ধরন আর তার একটা পাপড়ির আকার ভালমত দেখলেই খুব সহজেই গোটা ফুলটা নানান নকশায় ধরতে পারবে।

শেখো

কারিগর

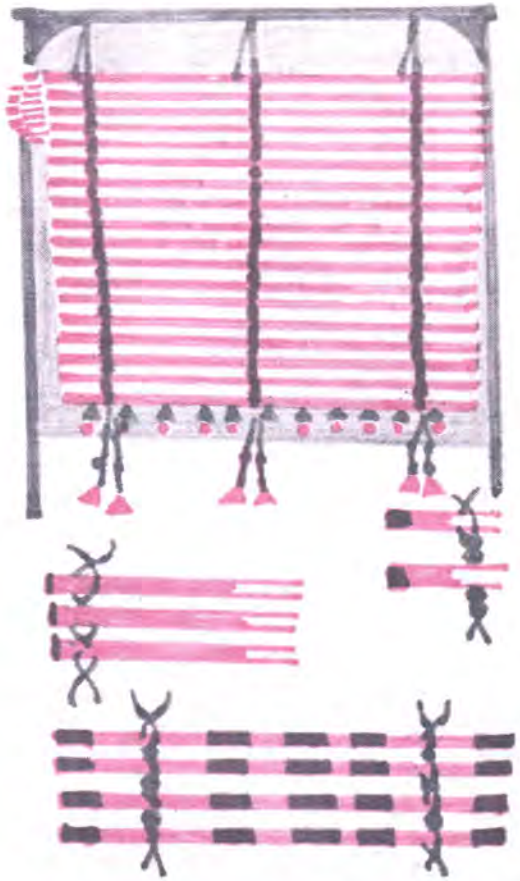

বাঁশের চিক

বাঁশের কাজের জন্যে জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো পাটের বা শনের দড়ি আর জল রং।

শুরু করো—তোমার যে জায়গাটা চিক দিয়ে আড়াল করা দরকার তার মাপমত মোটা বাঁশকে চিরে সরু করে কাঠি তৈরি করে নাও। এবার সেই সব সরু কাঠিকে ইচ্ছেমত রং-য়ে ছুপিয়ে বেশ ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে বোনার কাজ আরম্ভ করো।

দুটো দড়ি নিয়ে মাপমত একটা দড়িকে মেঝেতে পেতে তার ওপর কাঠি সাজিয়ে নাও। প্রথম কাঠি দড়ির ওপর ফেলে ওপর থেকে অন্য দড়ি দিয়ে কাঠিতে শক্ত করে গিট দাও। এইভাবে পরপর কাঠি সাজিয়ে গিট দিয়ে যাও। মনে রেখো, একটা কাঠির সঙ্গে আর একটা কাঠির যত ফাঁক রাখতে চাও—সেইমত ফাঁকের জন্য কেবল গিট দিলেই তা পাবে।

কাঠি বাঁধার সময় প্রথমে মাঝের দড়ি বাঁধবে, তারপর দু'পাশের। একটু ভাবলে এই দড়ি বাঁধারও নকশা হতে পারে। এইভাবে বাঁধার মধ্যে দিয়েই তোমার পছন্দমত চিক তৈরি করে নিতে কোন অসুবিধা হবে না। চিকের বাহারের জন্য নানা রং-এর পুঁতি বা কাপড়ের ফুল ব্যবহার করতে পার। চিকের কাঠির রং ইচ্ছে করলে নানান ভাগে ভাগ করে করলে সুন্দর সুন্দর নকশা পাবে। তবে এর জন্যে ভাবনাটা একটু আগে করে রাখতে হবে।

জেনে রাখো—(১) কাঠি তৈরি দুভাবে হয়—গোল বা একটু চ্যাপটা। চ্যাপটা হলে দড়ি বাঁধার জায়গায় একটু খাঁজ রাখবে। (২) যে মাপের চিক করবে তার অন্তত দু গুণ দড়ি নেবে। (৩) গিট না দিয়ে মাঝে মাঝে পুঁতি দিয়ে চিকের ফাঁক রাখতে পার। (৪) পাট বা শনের দড়ি কখনই যেন বেশি সরু না হয়। (৫) বাবুই-এর দড়ি ব্যবহার করবে না।

বিদেশী ছড়া

মণিকা দত্ত

(এই ছড়াগুলি কতকগুলি প্রচলিত জনপ্রিয়-ইংরেজি ছড়ার ভাব নিয়ে লেখা। আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে বড় নীরস হয়ে যায়; তাই অনেক সময় ভাবটুকু রেখে লেখা হয়েছে।)

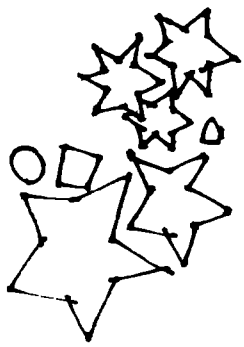

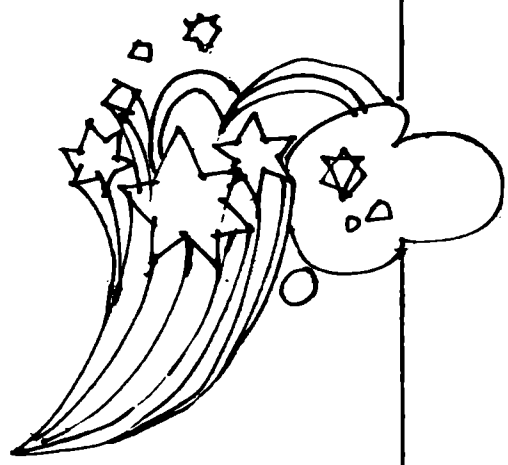

তারারা

ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌মিক্‌ তারারা হাসে—
রুপোলি জরির বুটি দূর আকাশে।
দূর বহুদূর ঐ আকাশের গায়
হীরকের দ্যুতি যেন তারারা ছড়ায়।

দিন গেলে, সাঁঝ এলে আকাশে আকাশে
তারাদের বাতি ওই সারারাত হাসে।
হাসে, আর মিট্‌মিট্‌ মিট্‌মিট্‌ চায়
রুপোলি জরির বুটি আকাশের গায়।

খুকুমণি

খুকুমণি তোর বাগানে ফুটল কটা ফুল?
সূর্যমুখী হাসছে—নাকি ঝুমকো দোদুল দুল?
ফুল-বাগিচায় ফুলরা হাসে ফুলপরীদের তুল্‌।

মিনি

মিনি, মিনি, ও মিনি তুই
কোথায় ছিলি বল্‌?
ভিন্‌দেশেতে দেখতে গেলুম
রানীর পায়ের মল্‌।

মিনি, মিনি, ও মিনি তুই
করলি সেথায় কী?
রানীর ঘরে ছোট্ট একটা
ইঁদুর ধরেছি।

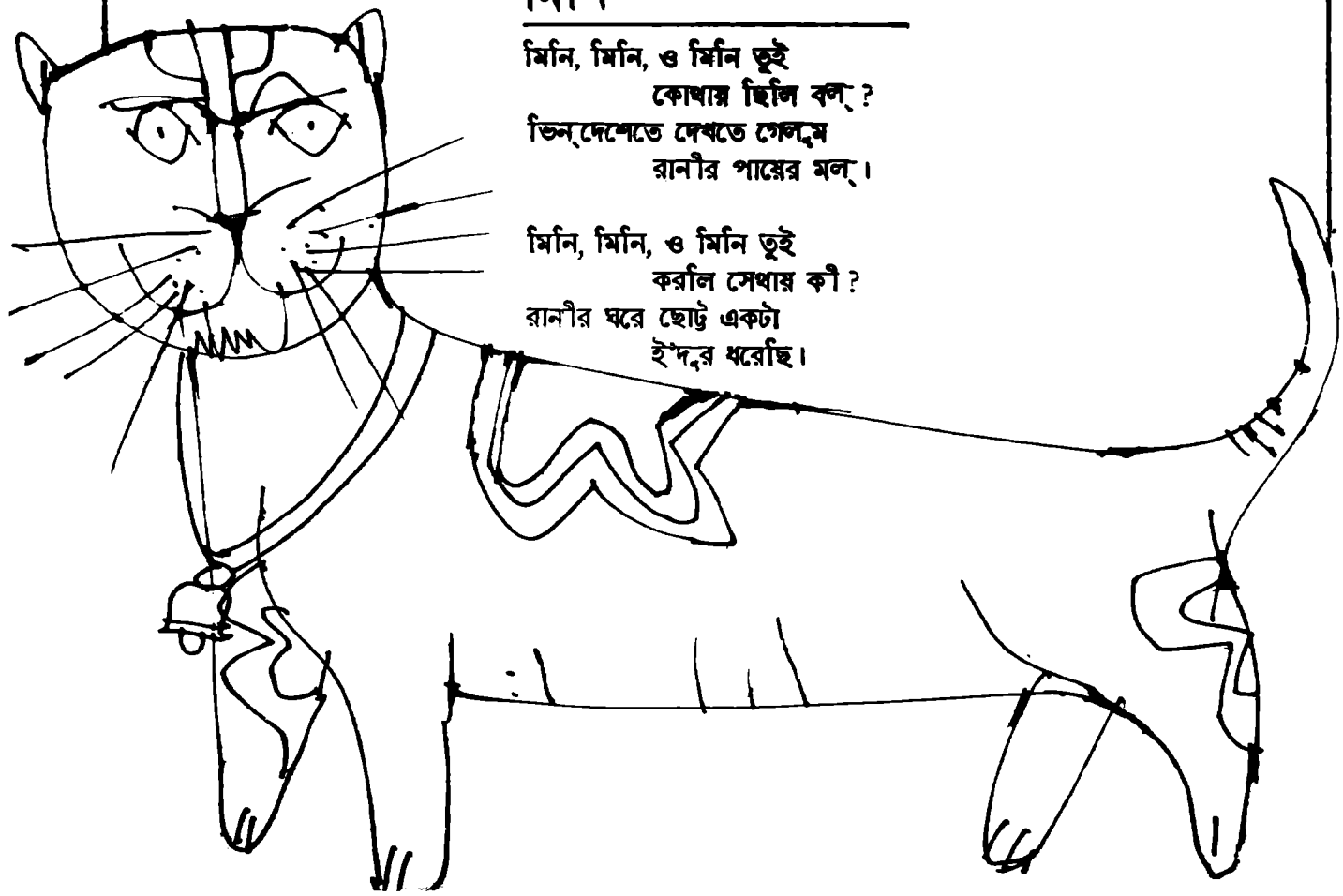

ANANDAMELA Regd. No. WB|CC 264

ভারতীয় ক্রিকেট-দলের অধিনায়ক
বিষেণ সিং বেদী
ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়